**Rajshahi University journal of social science and business studies** **ISSN 2309-0898**
**Vol. 28 (2020), pp 83-103**

# বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের সমান্তরাল অন্যান্য বিনোদন মাধ্যম ও শিল্পকলা: একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

**কাজী মামুন হায়দার***

**Abstract**

The film Industry of Bangladesh is currently in serious crisis in terms of market management, marketing and quality. The biggest symptom is that cinema halls are almost exhausted now a days. In this situation, other arts, entertainment media and various technological gadgets along with jatrapala, radio, television, newspaper, VCR, satellite television, computer, smart mobile phone set have worked in parallel with film in Bangladesh. Their multidimensional relationship with the different audience from various backgrounds, is observed in this study from an anthropological perspective. Ethnographic method has been employed on 258 professionals and contemporary viewers who have been working in the cinema halls of Bangladesh for the last 60 years (1956-2015). Analysis of the results shows that jatrapala has played an important role in domestic films. In addition, television and other technological medium/device have influenced the film business in different ways. However, film as an industry has not been able to hold its proper position as a medium.

***মূল শব্দ:*** বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, সমান্তরাল বিনোদন মাধ্যম, অন্যান্য গণমাধ্যম ও শিল্পমাধ্যম, প্রেক্ষাগৃহ, যাত্রাপালা, টেলিভিশন

## ভূমিকা

চলচ্চিত্র এমন এক গণমাধ্যম যা শ্রুতিদৃশ্যরূপে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, আলোকচিত্র, নাট্যকলার সমাহারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতারই আরেক প্রতিরূপকে উপস্থাপন করে। অন্য সব শিল্পমাধ্যম থেকে নবীন হলেও গুরুত্ব, দর্শকের অভিগম্যতা ও সামাজিক ভূমিকার কারণে বেশিরভাগ মৌলিক শিল্পমাধ্যমকে ছাপিয়ে গেছে চলচ্চিত্র। "চলচ্চিত্রের পুঁজিবাদী রূপ দর্শককে বিনোদন-বাজারের অক্রিয় ভোক্তায় অবিরত রূপান্তরিত করে, স্বপ্ন ও ভাবালুতায় মোহাচ্ছন্ন রেখে বিরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়ায় ঠেলে দেয় এবং ক্ষমতাবানের মতাদর্শিক হাতিয়ার হয়ে দর্শকমনে আধিপত্য কায়েম করে" (হক ২০১৩, পৃ১১)। আধিপত্য কায়েমের সঙ্গে সমাজ-বাস্তবতা নির্মাণেও চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চলচ্চিত্রনির্মিত সেই সমাজ-বাস্তবতার ভেতরেই সমাজের একটা বড়ো অংশ বেড়ে ওঠে। ফলে তা সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। চলচ্চিত্রের সামাজিকীকরণের ভূমিকাটি সম্ভবত এ কারণেই অন্য সব শিল্পমাধ্যমের তুলনায় অনন্য। এছাড়া চলচ্চিত্র সব সময় একটি নির্দিষ্ট কালখণ্ড বা সময়কে তুলে ধরে। এর মধ্য দিয়েই সে ইতিহাস নির্মাণ করতে চায়, অথবা নিদেনপক্ষে সমাজ ইতিহাসের উপকরণ হয়ে ওঠে, সমাজ ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র ভাষ্য এবং পরিসর হয়ে ওঠে।

তবে বাজার ব্যবস্থাপনা, বিপণনও মান বিবেচনায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বর্তমানে যেকোনো সময়ের চেয়ে গুরুতর সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে। এর সবচেয়ে বড়ো উপসর্গ প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হতে হতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। ২০০৫ সাল পর্যন্ত সারাদেশে প্রেক্ষাগৃহ ছিলো ১২০০টি। প্রদর্শক সমিতির হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯০ থেকে ২০১১

* সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ; E-mail: kmhaiderru@yahoo.com

পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে প্রায় ৫৫২টি প্রেক্ষাগৃহ (*সমকাল*, ৩ জুলাই ২০১১)। ২০১৩ সালের হিসাবে প্রেক্ষাগৃহ ছিলো ৪১৫টি (ঝুমা ২০১৪, পৃ ৮৫–১০১)। বর্তমানে সেই অর্থে দেশে প্রেক্ষাগৃহ নেই বললেই চলে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সমসাময়িক চলচ্চিত্রের সঙ্কট বোঝার জন্য এর ঐতিহাসিক রূপ বোঝা খুব জরুরি। এবং সেটা চলচ্চিত্রের আধেয় বা ব্যবসায়িক সাফল্য বিচার-বিশ্লেষণের চেয়ে প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী এবং নানা পেশার চলচ্চিত্র দর্শকের জায়গা থেকে বিশ্লেষণ করাটা বেশি জরুরি। সনাতন ইতিহাসবিদ্যা যে উপরিতল থেকে যেসব উপাত্তের ভিত্তিতে কাজ করে, তার বিপরীতে নৃবিজ্ঞান মাইক্রো পর্যায়ের সমাজ-বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে চলচ্চিত্রের মতো সুবিশাল ও জটিল প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। ফলে সমাজ-রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা অংশের মানুষের অভিজ্ঞতা ও আখ্যানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস। ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তার জায়গা থেকে দেখা এই নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা খুব সহজেই সমস্যার এমন সব মূলে পৌঁছাতে পারে যা প্রথাগত ইতিহাসের পক্ষে সম্ভব হয় না। আর এই সমস্ত কারণেই নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আত্মীকরণ এই গবেষণায় কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত প্রবণতা হয়ে উঠেছে খুব অনিবার্যভাবে।

**গবেষণার উদ্দেশ্য**

এই গবেষণায় চলচ্চিত্র ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ককে উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে অন্তত একটি পরিসরকে মনযোগের কেন্দ্রে রেখে—যেখানে চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয় তথা প্রেক্ষাগৃহ এবং তার পারিপার্শ্বিক সমাজ বাস্তবতার জমিনে বিচরণশীল দর্শক। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও তার সমান্তরালে চলা অন্যান্য শিল্পমাধ্যম, গণমাধ্যমের যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট করে গবেষণার মূল উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

**প্রথমত**, তৃণমূল দর্শক এবং প্রেক্ষাগৃহ কেন্দ্রিক জন-জীবনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সমান্তরালে চলা অন্যান্য শিল্পমাধ্যম, গণমাধ্যম ও বিভিন্ন প্রাযুক্তিক মাধ্যমের (যাত্রাপালা, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ভিসিআর, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, কম্পিউটার, স্মার্ট মোবাইল ফোনসেট) যে ইতিহাস তা পুনঃপাঠ ও বিশ্লেষণ করা।

**দ্বিতীয়ত**, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর সাথে চলচ্চিত্র, অন্যান্য গণমাধ্যম ও শিল্পমাধ্যমের যে বহুমাত্রিক সম্পর্ক তা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা।

**শ্রেণি, পুঁজি ও শিল্পমাধ্যম-গণমাধ্যম**

অতীতে পেশাদার যাত্রাদলগুলো ঘুরে ঘুরে যাত্রা দেখাতো বা যাত্রা সামাজিকভাবে আয়োজিত হতো। সাধারণত কোনো যাত্রাদল এক মৌসুমের জন্য কিছু কাহিনি বা উপাখ্যান প্রস্তুত করতো। তারপর তা প্রদর্শন হতো বিভিন্ন স্থানে। যাত্রা আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা করতো সাধারণত গ্রামের ধনিক শ্রেণি। এটা তারা করতো নিজেদের প্রয়োজনেই, কারণ সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে যে শাসন-শোষণ ছিলো, তার বিপরীতে নিম্ন শ্রেণির ওইসব মানুষের চিত্ত বিনোদনের দায়ও ছিলো ধনিক শ্রেণির ওপর। ব্যাপারটা অনেকটাই আজকের জনকল্যাণ রাষ্ট্রের মতো। কিন্তু যাত্রার গল্প যখন চলচ্চিত্রে ট্রান্সফর্ম হয়ে বেনিয়া-পুঁজির দখলে গেল, তখন দেখা দিলো একধরনের স্ববিরোধিতা। স্ববিরোধিতাটা হলো, টেকনোলজি নিয়ে আদতে মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা আছে—সেটা পশ্চিম ও ইউরোপেও একই—তারা এর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়। ফলে টেকনোলজি কাম শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে। আজকে পর্যন্ত চলচ্চিত্রে 'সুস্থধারা'র তকমা লাগিয়ে যা টিকে আছে, সেটা মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রণেই। অন্যদিকে চলচ্চিত্রকে বাণিজ্যিকভাবে টিকে থাকার জন্য জনমানুষ থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে।

খেয়াল করলে দেখা যায়, জনপ্রিয় যাত্রাপালাগুলো বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের প্রথম ৩০–৪০ বছরেই চলচ্চিত্র ফরমেটে চলে এসেছে। যার শুরু ১৯৬৫ সালে সালাহ্উদ্দিনের *রূপবান* দিয়ে। যাত্রাপালাকে চলচ্চিত্রে নিয়ে

আসার মধ্য দিয়ে জনমানুষের উপাদানকেই মূলত চলচ্চিত্রে আনা হয়। এগুলো ব্যবহৃত হতে থাকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। সেখানে সমাজ কতোটা প্রতিফলিত হলো, তার ইমেজের শক্তিইবা কী ধরনের, কিংবা প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে নতুন পরিবেশে এ ধরনের কাহিনি দেখতেই বা কেমন লাগে—চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। এছাড়া টেকনোলজির ট্রান্সফরমেশনটা এখানে কীভাবে কাজ করলো; কীভাবে একটা 'মোড অব অ্যাসথেটিকস্ প্রোডাকশন' আগের 'মোড অব অ্যাসথেটিকস্ প্রোডাকশন'কে প্রতিস্থাপন করলো? এটাকে দুই পুঁজির যুদ্ধ কিংবা দুইটা আর্ট ফর্মের টিকে থাকার অবস্থা হিসেবেও দেখা যায়।

অনুমান যদি এমন হয়, প্রথম ধাপে যেটা হয়েছে, যাত্রার উপাখ্যানের একটা সফল ট্রান্সফরমেশন মানে *রূপবান* থেকে *বেদের মেয়ে জোসনা* হয়ে আজকের অবস্থা। দ্বিতীয়ত, শহুরে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজেদের মতো করে আরেক ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চেয়েছে। এতে চলচ্চিত্রের দুইটা ধারা তৈরি হয়ে গেলো। সন্দেহ নেই, ৬০-এর দশকে প্রেক্ষাগৃহে যেতো মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির দর্শকরাই। কারণ প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা কম এবং এগুলোর অবস্থান শহরে হওয়ায় অন্যদের দেখার সুযোগ কম ছিলো। তারপরও প্রাযুক্তিক জাদুময়তায় নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত দর্শক তখন সুযোগ পেলেই চলচ্চিত্র দেখেছে।

পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্তের প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে যাওয়া এবং দেশীয় চলচ্চিত্রে যৌন উপাদানের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার মধ্যে অনেকেই যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রবণতা একটা প্রশ্ন উসকে দেয়। "রুচির অবনমন যদি মধ্যবিত্তের সিনেমা হল বিমুখতার প্রধান কারণ হয় তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, ১৯৬০ দশকের ছবিগুলো কী এমন মহত্বে উদ্ভাসিত ছিল যে তাতে মধ্যবিত্ত দলে দলে সিনেমা হলে যেতেন" (শুভ ১৪১৬, পৃ৪৮)? লোককাহিনি, ফ্যান্টাসি আর নাচ-গান ৬০-এর দশকের চলচ্চিত্রের প্রধান অনুষঙ্গ ছিলো। ২০ শতকের শেষ ও একুশ শতকের শুরুর বছরগুলোর মতো যৌন উপাদানের প্রদর্শন তখন চলচ্চিত্রে না থাকলেও অল্পবিস্তর তো ছিলোই। কাজেই মানের পতন কিংবা যৌন উপাদান বেড়ে যাওয়ায় মধ্যবিত্ত প্রেক্ষাগৃহ ছেড়েছে—এমন সিদ্ধান্ত টেনে মধ্যবিত্তের রুচির ওপর মহত্ব আরোপের খুব একটা সুযোগ নেই।

৭০–৯০'র দশকে মিশ্র মাধ্যম টেলিভিশন তার নিজস্ব কনটেন্টের বাইরে চলচ্চিত্র দেখানোর ফলে চলচ্চিত্র মাধ্যমটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। টেলিভিশনে জাতি-রাষ্ট্রগত সীমানাগুলো পার হতে থাকলে এর চাপ গিয়ে পড়লো চলচ্চিত্রের ওপরে। একদিকে মুম্বাইয়ের তৎকালীন চলচ্চিত্রকে টেক্কা দেওয়া, অন্যদিকে মধ্যবিত্তের টেলিভিশন আসক্তিতে প্রেক্ষাগৃহের উদ্দিষ্ট দর্শক হয়ে গেলো নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত। ফলে তাদের আকৃষ্ট করতে স্বভাবতই চলচ্চিত্রে যৌন উপাদান যোগ হতে থাকে। এই দ্বন্দ্বগুলোকে তুলে আনলে বোঝা যাবে, একদিকে শ্রেণি আরেকদিকে টেকনোলজি। টেকনোলজির ধারাবাহিকতায় পরে একে একে এসেছে ভিসিআর, সিডি, ডিভিডি, ডিস অ্যান্টেনা, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্মার্ট মোবাইল ফোনসেট। যা একদিকে যেমন শ্রেণিকে প্রভাবিত করেছে, অন্যদিকে প্রভাব ফেলেছে খোদ চলচ্চিত্রের ওপর।

**তাত্ত্বিক কাঠামো : নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস ও পর্যালোচনা**

বর্তমান গবেষণাটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস হিসেবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এখানে প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সরাসরি জড়িত মানুষগুলোর যাপিত জীবনের আখ্যান রচনার মধ্য দিয়ে সেটার অনুসন্ধান করা হয়েছে। জাকির হোসেন রাজু (Raju 2015) বাংলাদেশের জাতি-রাষ্ট্র ধারণা নির্মাণে চলচ্চিত্রকে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সেখানে দর্শক একেবারেই অনুপস্থিত। এছাড়া লোটে হুক (Hoek 2014) তার গবেষণায় একটি বিশেষ সময়ের (সহিংস ও যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের সময়) একটি চলচ্চিত্রের নির্মাণ থেকে প্রদর্শন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত গবেষণায় নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস চর্চার ধারা দেখা যায় না বললেই চলে।

চলতি গবেষণায় দর্শককে 'সক্রিয় সামাজিক কর্তা' (social actor) হিসেবে দেখা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহকে দেখা হয়েছে একটি সামাজিক আচার ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে। প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও নানা পেশার চলচ্চিত্র দর্শকের বোঝাপড়া এথনোগ্রাফির মাধ্যমে তুলে আনা হয়েছে; সঙ্গে গবেষকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো রয়েছেই। গবেষণা-মাঠ থেকে উঠে আসা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা ও গবেষকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও তার সমান্তরালে অন্যান্য গণমাধ্যম, শিল্পকলার ও বিভিন্ন প্রাযুক্তিক মাধ্যমের একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা হাজিরের চেষ্টা করা হয়েছে।

সাধারণ ইতিহাসের লেখক তার সংগৃহীত তথ্য থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য বেছে নিয়ে বাদবাকি মালমশলা ফেলে দিতে পারেন। কিন্তু নৃবিজ্ঞানী শুধু তথ্য সাজান এবং তার ব্যাখ্যা দেন ব্যাপারটা এমন নয়, তিনি তথ্যের স্রষ্টাও বটে (ইভান্স-প্রিচার্ড ২০০৯, পৃ ৮২–৮৩)। "আজকের নৃবিজ্ঞানী বিশাল ক্যানভাসে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে দায়িত্ব বলতে যা বোঝায় সেই ধারণার বিকাশ কাহিনি কিংবা রাষ্ট্রের বিকাশ কাহিনি অংকন করবার চেষ্টা করেন না। আজকের নৃবিজ্ঞানী কাজ করেন কিছু ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে যেগুলোর অনুসন্ধান সরাসরি তদন্ত ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে পরিচালনা করা সম্ভব" (ইভান্স-প্রিচার্ড ২০০৯, পৃ ৮৫)।

ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তীর একটি প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা আছে এ বিষয়ে—"... আজকের ভারতবর্ষে যদি ইতিহাসের জনজীবন তৈরি করতে হয়, তা আর স্বদেশিযুগের জাতীয়তাবাদী চিন্তা দিয়ে করা সম্ভব নয়। এমনকী কেবলমাত্র বই লিখেও হবে না। ঐতিহাসিককে অন্য মিডিয়া—প্রদর্শনী, সিনেমা, টেলিভিশন, ইন্টারনেট—বুঝতে ও শিখতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি শুরু হলে 'ইতিহাস' বিষয়টিও বদলাতে শুরু করবে। আমরা যাকে 'ইতিহাস-গবেষণা' বলে জানি, তা উঠে যাবে বলছি না। আমাদের পরিচিত ইতিহাসবিদ্যা থাকবে। তবে সেই উনবিংশ-শতাব্দীতে উদ্ভাবিত 'ইতিহাস-বিজ্ঞান' এর পাশাপাশি অন্য নানাবিধ 'অতীত'-এরও—ব্যক্তিগত ও বহুজনের স্মৃতির, মিথের, মিডিয়া-সৃষ্ট স্মৃতির—চর্চা শুরু হবে" (চক্রবর্তী ২০১১, পৃ৪৬)। তবে এই ব্যক্তিগত ও বহুজনের যে স্মৃতিকথা তা কিন্তু মোটেও সহজ কোনো বিষয় নয়। কারণ "স্মৃতি বিষয়টি বলা বাহুল্য, একটি জটিল বিষয়। কখনও আমরা মনে করি, কখনও আমাদের মনে পড়ে। 'মনে করা' আর 'মনে পড়া' তো এক নয়। তা ছাড়া স্মৃতি কেবল 'মন' আশ্রয় করে বেঁচে থাকে না। আমাদের শরীরে, অভ্যেসে, প্রাত্যহিকতায়, শিক্ষায় জড়ানো থাকে স্মৃতি। স্মৃতির অনেকটা সামাজিক ব্যবহারেরও অংশ। কাউকে নিয়ে প্রদর্শনী তৈরি করা, শহিদ-মিনার গড়া—এ সবও তো স্মৃতিচর্চা। স্মৃতিচর্চার ইতিহাসও থাকে" (চক্রবর্তী ২০১১, পৃ ৯২–৯৩)। তার মানে স্মৃতির রাজনীতি আছে। তাই ইতিহাস লেখার সময় সেই রাজনীতিকে মাথায় রাখতে হয়। একজন দক্ষ নৃবিজ্ঞানী ব্যক্তির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন, যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা বেরিয়ে আসে। এই ক্ষেত্রে ইতিহাস এবং নৃবিজ্ঞান অবশ্যই পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। অন্যভাবে বললে, একজন নৃবিজ্ঞানী, একজন ইতিহাসবিদকে কোনো কিছুর নথি, পাণ্ডুলিপি, চিত্রকলা, দিনলিপি ও অতীতকে তুলে ধরে—এমন উপাদানের ওপরই নির্ভর করতে হয়।

এই গবেষণাটি চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস এই কারণে যে, এটি রচিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও নানা পেশার চলচ্চিত্র দর্শকের কাছ থেকে চলচ্চিত্রের মাইক্রো সোশ্যাল রিয়েলিটির আখ্যান সুনির্দিষ্ট নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও সংকলনের মধ্য দিয়ে। সেই অনুসন্ধানের সঙ্গে যেমন গবেষকের নিজের অভিজ্ঞতাকে মেলানো হয়েছে, তেমনই এ সংক্রান্ত যে বিদ্যমান তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত তার বোঝাপড়াও সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এই তিনের সমন্বয়ে যে ইতিহাস রচনা করা হয়েছে, তাই চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস হিসেবে প্রস্তাব করছে এই গবেষণাকর্ম।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্কটা অনেকখানি দ্বিমুখী—দুই পক্ষই নিজেদের স্বার্থে দুইজনকে চ্যালেঞ্জ করে না। ফলে একদিকে চলচ্চিত্র যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে রিপ্রেজেন্ট করে, অন্যদিকে এর গতি-প্রকৃতিও চলচ্চিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর এসব ঘটনা ঘটে মানে অ্যাখানটা (ন্যারেটিভ) যেখানে প্রদর্শিত হয়, সেটা প্রেক্ষাগৃহ। এখানে সক্রিয় সামাজিক সত্তা (Social Actor) হলো দর্শক। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও বয়সের দর্শকের মিলনস্থল প্রেক্ষাগৃহ। এই প্রেক্ষাগৃহকে এথনোগ্রাফিকালি দেখা হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের মিথস্ক্রিয়াটা কীভাবে ঘটে সেটা এই গবেষণার কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রানুসন্ধানের পরিসর। এই সংক্রান্ত বোঝাপড়ার জন্য হেবারমাস-এর জনপরিসর (Public Sphere) সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রভাব রয়েছে এই গবেষণায়। জারগেন হেবারমাস-এর ভাষ্যমতে, 'The public sphere is seen as a domain of social life where public opinion can be formed' (Habermas 1991, p398)। ফলে প্রেক্ষাগৃহকে জনপরিসর হিসেবে দেখার অবকাশ আছে এবং এই গবেষণায় প্রেক্ষাগৃহকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরে নিয়ে জনপরিসর হিসেবে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। হেবারমাস এই জনপরিসরকে মানুষের মতামত বা চিন্তার একটি 'প্রজননস্থল' হিসেবে দেখেন। প্রেক্ষাগৃহের মতো জনপরিসরে সব ধরনের লোকজনের অবাধ যাতায়াতের সুযোগ থাকে এবং তারা যেকোনো বিষয়েই আলাপ করতে পারে।

**গবেষণা পদ্ধতি**

এই গবেষণাটি নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এথনোগ্রাফিক ধারায় সম্পাদিত একটি গুণগত গবেষণা। তাই এ গবেষণার পদ্ধতি নির্বাচন ও নকশার ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণার অধুনা ও অধুনান্তিক পদ্ধতিগুলোর আশ্রয় নিতে হয়েছে। এখানে একদিকে যেমন আখ্যানমূলক বিশ্লেষণ (ন্যারেটিভ অ্যানালিসিস[১]) করা হয়েছে; অন্যদিকে এথনোগ্রাফির অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ও নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার হয়েছে। এই গবেষণায় আখ্যানবিদ্যা (ন্যারেটোলজি[২]) ব্যবহার করা হয়েছে এথনোগ্রাফির মাঠ ও চলচ্চিত্রের সমসাময়িক দর্শকের সাক্ষাৎকার থেকে উঠে আসা আখ্যান বিশ্লেষণে।

চলতি গবেষণায় প্রেক্ষাগৃহকে মাঠ ধরে জানুয়ারি ২০১৬ থেকে মে ২০১৮ পর্যন্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সব প্রেক্ষাগৃহকে সমগ্রক ধরে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে দেশের মোট জেলাকে আটটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এসব সাংস্কৃতিক অঞ্চল নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিবেচনার বিষয় হিসেবে ভাষাকে রাখা হয়েছে। কারণ এই অঞ্চলগুলো বাংলা ভাষার আটটি ভিন্ন ধারার আঞ্চলিক ভাষার প্রতিনিধিত্ব করে। এই আটটি অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও আছে। এদের প্রত্যেকের আকর ও লোকায়ত সংস্কৃতি একেবারে আলাদা। একটি নতুন মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র এসব অঞ্চলের পূর্বাপর যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলো ছিলো/আছে তার সঙ্গে একধরনের মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। এজন্য এই আটটি অঞ্চলকে আলাদা করে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এ গবেষণায়।

এই আটটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের প্রত্যেকটির জেলা সদরের সবকটি এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে (যে উপজেলায় প্রেক্ষাগৃহ আছে) অঞ্চলভুক্ত অন্য একটি জেলার একটি উপজেলার সব প্রেক্ষাগৃহে এথনোগ্রাফিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। যেমন: রাজশাহী সদর ও নওগাঁর পত্নীতলা; চট্টগ্রাম সদর ও কুমিল্লার লাকসাম; রংপুর ও কুড়িগ্রাম সদর; যশোর ও কুষ্টিয়া সদর; খুলনা ও সাতক্ষীরার দেবাহাটা; বরিশাল ও পটুয়াখালী সদর; সিলেট ও মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল; ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা সদর।

প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থেকে চলচ্চিত্র দেখা, নানা পেশার চলচ্চিত্র দর্শককে পর্যবেক্ষণ এবং ২৫৮ প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও নানা পেশার চলচ্চিত্র দর্শকের অনানুষ্ঠানিক ও কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

**টেবিল নং ১:** প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের পেশা ও লৈঙ্গিক উপস্থাপন

| **এথনোগ্রাফিতে অংশগ্রহণকারীদের পেশা** | **লৈঙ্গিক পরিচয়** (পুরুষ) | **লৈঙ্গিক পরিচয়** (নারী) | **মোট** |
|---|---|---|---|
| প্রেক্ষাগৃহের মালিক | ১৪ | ০ | ১৪ |
| ব্যবস্থাপক | ১৯ | ০ | ১৯ |
| সুপারভাইজার | ৮ | ০ | ৮ |
| প্রজেক্টর অপারেটর | ১৯ | ০ | ১৯ |
| সাধারণ কর্মচারী | ২২ | ১ | ২৩ |
| টিকেট বিক্রেতা (বুকিং ক্লার্ক) | ১৬ | ০ | ১৬ |
| টিকেট কালোবাজারি | ৮ | ০ | ৮ |
| গেইটম্যান | ৩৮ | ০ | ৩৮ |
| পাবলিসিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত | ১০ | ০ | ১০ |
| চলচ্চিত্রের প্রতিনিধি | ৮ | ০ | ৮ |
| প্রেক্ষাগৃহের সাইকেল গ্যারেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত | ২ | ০ | ২ |
| বুকিং এজেন্ট | ১ | ০ | ১ |
| নৈশপ্রহরী | ৫ | ০ | ৫ |
| ক্যান্টিন পরিচালনাকারী | ১ | ০ | ১ |
| প্রেক্ষাগৃহের পাশের চা-পান দোকানদার | ৩০ | ০ | ৩০ |
| বাদামওয়ালা ও ঝালমুড়িওয়ালা | ৭ | ০ | ৭ |
| যৌনকর্মী | ০ | ১ | ১ |
| দর্শক | ৪৩ | ৫ | ৪৮ |

এক্ষেত্রে দুটি বিষয় খুব গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়েছে—প্রথমত, চলচ্চিত্র নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্টদের অভিজ্ঞতা, স্মৃতিতে[৩] থাকা উপাত্ত; দ্বিতীয়ত, চলচ্চিত্র নিয়ে তাদের ভাবনা। অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি থেকে উপাত্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ডায়াক্রনিক[৪] মানে পরম্পরা বা ঐতিহাসিকতা যেমন মাথায় রাখা হয়েছে, তেমনি সিনক্রোনিক[৫] মানে সমসাময়িক বিষয় ধরা হয়েছে।

এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মে অংশগ্রহণকারী ২৫৮ উত্তরদাতার মধ্যে প্রেক্ষাগৃহের মালিক, ব্যবস্থাপক, প্রজেক্টর অপারেটর, টিকেট বিক্রেতা, কাউন্টারের বাইরের টিকেট বিক্রেতা, লাইনম্যান, গেইটম্যান, প্রচারকারী, চলচ্চিত্রের প্রতিনিধি, সাইকেল গ্যারেজের মালিক, চা-পান দোকানদার, বাদামওয়ালা, ঝালমুড়িওয়ালা, যৌনকর্মী ছিলেন মোট ২১০। এই উত্তরদাতাদের মধ্যে নারীকর্মী এক, নারী যৌনকর্মী এক। বাকি ৪৮ উত্তরদাতা নানা পেশার চলচ্চিত্র দর্শকের মধ্যে নারীর সংখ্যা পাঁচ ও পুরুষ ৪৩।

**টেবিল নং ২:** সাংস্কৃতিক অঞ্চলভেদে নানা পেশার চলচ্চিত্র দর্শকের লৈঙ্গিক উপস্থাপন

| **সাংস্কৃতিক অঞ্চল** | **যে অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে** | **দর্শক** (নারী) | **দর্শক** (পুরুষ) | **দর্শক** (হিজড়া) | **মোট** |
|---|---|---|---|---|---|
| সাংস্কৃতিক অঞ্চল ১ | রাজশাহী সদর ও নওগাঁর পত্নীতলা | ১ | ১০ | ০ | ১১ |
| সাংস্কৃতিক অঞ্চল ২ | চট্টগ্রাম সদর ও কুমিল্লার লাকসাম | ০ | ০ | ০ | ০ |
| সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৩ | রংপুর সদর ও কুড়িগ্রাম সদর | ০ | ৩ | ০ | ৩ |
| সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৪ | যশোর সদর ও কুষ্টিয়া সদর | ২ | ১৪ | ১ | ১৭ |
| সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৫ | খুলনা সদর ও সাতক্ষীরার দেবাহাটা | ১ | ১০ | ০ | ১১ |
| সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৬ | বরিশাল সদর ও পটুয়াখালী সদর | ০ | ২ | ০ | ২ |
| সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৭ | সিলেট সদর ও মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল | ০ | ০ | ০ | ০ |
| সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৮ | ময়মনসিংহ সদর ও নেত্রকোণা সদর | ১ | ৩ | ০ | ৪ |

**টেবিল নং ৩:** নানা পেশার চলচ্চিত্র দর্শকের পেশা ও লৈঙ্গিক উপস্থাপন

| দর্শকের পেশার ধরন | নারী | পুরুষ | মোট |
|---|---|---|---|
| শিক্ষার্থী | ৩ | ১৭ | ২০ |
| ইলেকট্রিশিয়ান | ০ | ১ | ১ |
| রাজমিস্ত্রী | ০ | ১ | ১ |
| অটোরিকশা চালক | ০ | ৭ | ৭ |
| শিশুশ্রমিক | ০ | ২ | ২ |
| গৃহিনী | ২ | ০ | ২ |
| পরিবহন শ্রমিক | ০ | ২ | ২ |
| সাংস্কৃতিক কর্মী | ০ | ১ | ১ |
| ব্যবসায়ী | ০ | ৫ | ৫ |
| ওষুধ বিক্রয় প্রতিনিধি | ০ | ১ | ১ |
| দোকান কর্মচারী | ০ | ১ | ১ |
| আইনজীবী | ০ | ১ | ১ |
| হোমিও চিকিৎসক | ০ | ১ | ১ |
| দর্জি | ০ | ১ | ১ |
| সরকারি চাকুরিজীবী | ০ | ১ | ১ |
| বেকার | ০ | ১ | ১ |

নানা পেশার চলচ্চিত্র দর্শকের বেশিরভাগই শিক্ষার্থী (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের); এছাড়া পেশায় গৃহিনী, ব্যবসায়ী, পরিবহন শ্রমিক, আইনজীবী, অটোরিকশা চালক রয়েছেন।

**যাত্রাপালা থেকে চলচ্চিত্রের জাদুময়তায়**

৬০-এর দশক ও এর আগে চলচ্চিত্রের সমান্তরালে ছিলো যাত্রাপালা, নাটক, জারি গান, সারি গান ও কবি গান। তখন রেডিওরও জনপ্রিয়তা ছিলো। রেডিওর গুরুত্বের অন্যতম প্রধান কারণ ছিলো সংবাদ। এছাড়া এতে নিয়মিত গান, বিশেষ করে সিনেমার গান ও বিজ্ঞাপন সম্প্রচার হতো। তবে সেসময় রেডিওর সংখ্যা ছিলো অনেক কম। দুই–তিন গ্রাম মিলে হয়তো রেডিও ছিলো একটা। বিশেষ পরিস্থিতিতে গ্রামের সবাই বিশেষ কোনো দোকান বা বাড়িতে ভিড় করতো। খুলনার 'সোসাইটি সিনেমা'র সুপারভাইজার মো. নাঈমের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা হয় প্রেক্ষাগৃহের পাশের চায়ের দোকানে। নাঈম বলেন, 'আমাদের একটা রেডিও ছিলো, সন্ধ্যা সাতটায় সেখানে দুর্বার অনুষ্ঠান হতো। আশেপাশের লোকজন সন্ধ্যা থেকে জানালায় এসে আব্বাকে বলতো, খালু একটু গান দেনতো শুনি। লোকজন একটা গান শোনার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতো!'

তবে এ সময় শিল্পমাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে সক্রিয় ছিলো যাত্রাপালা। যাত্রার সমান্তরালে দর্শকমনে চলচ্চিত্র জায়গা করে নিয়েছিলো। যাত্রা দেখা দর্শকই পরে চলচ্চিত্রে আগ্রহী হয়। ফলে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা যাত্রা নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়েছেন। এই ভাবনার শুরু ১৯৫৫ সালে জনপ্রিয় পালা 'মহুয়া'কে চলচ্চিত্রে রূপান্তর চেষ্টার মাধ্যমে। পালাগান কিংবা যাত্রার কাহিনিকে চলচ্চিত্রায়ণের এটিই ছিলো প্রথম প্রচেষ্টা (বাগচী ২০০৭, পৃ ১৭৮)। "সামিরা স্টুডিওর মালিক জনাব আলী এই ছবির প্রযোজক ছিলেন। ওই ছবির নায়িকা ছিলেন রাণী সরকার, চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন সাধন রায়" (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ ৩৮)। কিন্তু চলচ্চিত্রটি পরে মুক্তি পায়নি।

৬০ দশকের শুরুতে যাত্রাপালা হিসেবে 'রূপবান' ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। শুধু 'রূপবান' যাত্রাপালার অভিনয়ের জন্য বেশকিছু যাত্রাদল গড়ে ওঠে। এই জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে 'রূপবান' যাত্রার গ্রামোফোন রেকর্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। গ্রামোফোন বিক্রির পরিমাণও ছিলো অবিশ্বাস্য (বাগচী ২০১১, পৃ৩৬)। কবি জসীমউদ্‌দীন 'রূপবান' রেকর্ডের সফলতাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে—"শুনিতে পাইলাম গত কয়েক মাসে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) রেকর্ড বিক্রি হইয়াছে। গ্রামদেশের পথে-ঘাটে বিচরণ করিলে পাঠক শুনিতে পাইবেন কোথাও না কোথাও হইতে কেহ না কেহ রূপবান যাত্রার কোন গান গাহিয়া চলিয়াছে। একাধিক জায়গায় রূপবান যাত্রার অভিনয় দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। তাহাতে দেখিয়াছি, ২০/২৫ হাজার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সারারাত জাগিয়া এই গান উপভোগ করিয়াছে। ইহাতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে এই গান বাঙালির মনে কতটা স্থান লাভ করিয়াছে" (জসীমউদ্‌দীন ১৯৯৭)।

যাত্রাপালা 'রূপবান'[৬]-এর এই জনপ্রিয়তা প্রভাব বিস্তার করে চলচ্চিত্রশিল্পে। চিত্রকর্মী সফদার আলী ভুঁইয়ার অনুপ্রেরণায় সালাহ্‌উদ্দিন 'রূপবান' চলচ্চিত্রায়িত করেন। চলচ্চিত্রটি সুপারহিট হয় যাত্রা-নাটকের মতোই (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ১১৭)। *রূপবান* মুক্তি পায় ১৯৬৫ সালে ৫ নভেম্বর ঢাকার ছয়টি প্রেক্ষাগৃহে। *রূপবান*-এর জনপ্রিয়তা নিয়ে মজার তথ্য দেন বরিশালের এস এম ইকবাল। বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের সভাপ্রধান ও এক সময়ের নিয়মিত দর্শক এস এম ইকবালের সঙ্গে কথা হয় বরিশাল প্রেসক্লাবে বসে। তার ভাষ্যমতে, 'সেই সময় আরেকটা সিনেমা খুব ব্যবসা করছে *রূপবান*। তখন তো *রূপবান* যাত্রাপালাও হতো। আমি শুনেছি, রূপবান যাত্রাপালার মঞ্চে যে বাঁশটা ধরে নায়িকা রূপবান কাঁদতো, সেটাও নাকি কয়েক শো টাকায় বিক্রি হতো।'

*রূপবান*-এর ব্যাপারে একটা বিষয় লক্ষণীয়, 'রূপবান' যাত্রাপালা থেকে ধীরে ধীরে যান্ত্রিক রূপান্তর ও পুনরুৎপাদন হয়েছে—প্রথমে গ্রামোফোন রেকর্ড, এরপরে চলচ্চিত্রের সেলুলয়েডে। চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তিক জাদুময়তার সঙ্গে 'রূপবান'-এর চির চেনা আখ্যানের সম্মিলনে দর্শক একদিকে যেমন অভিভূত হয়েছে, অন্যদিকে অচেনা এই মাধ্যমটিকে তারা প্রথম আপন করে নিতে পেরেছিলো। পরে অবশ্য ব্যবসায়িক কারণে *রূপবান*-এর পুনরুৎপাদন হয়েছে আরো নানা নামে—*রহিম বাদশা ও রূপবান*, *আবার বনবাসে রূপবান*ও *রঙিন রূপবান*।

তবে এ সময় যাত্রাপালা ও রেডিওর বাইরে পূর্ব পাকিস্তানের দৈনিক সংবাদপত্রে ৫০ দশকের প্রথম ভাগেই চলচ্চিত্র নিয়ে আলাদা পাতা চালু হয়। দৈনিক পত্রিকার বাইরে অনেকগুলো মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাও তখন প্রকাশ হয়, যেগুলোর মূল আধেয় ছিলো চলচ্চিত্র। দৈনিক পত্রিকার আকারে 'চিত্রালী' প্রথম পরীক্ষামূলক প্রকাশ হয় ১৯৫৩ সালের ১৩ জুন (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ ১৪১)। দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্পের জন্মের আগে থেকে এই পত্রিকাটি চিত্রনির্মাণ, চিত্র সাংবাদিকতা তথা এদেশের শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া ১৯৬৭ সালে প্রকাশ হয় চলচ্চিত্রবিষয়ক প্রথম গবেষণাধর্মী পত্রিকা 'ধ্রুপদী'[৭]। চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক, কারিগরি এবং অন্যান্য দিক নিয়ে গবেষণামূলক লেখায় সমৃদ্ধ ছিলো 'ধ্রুপদী'।

**যুক্ত হলো বোকা বাক্সের খেলা**

৭০ দশকেও গ্রামবাংলায় বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে যাত্রার দাপট ছিলো চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে শীতের মৌসুমে দেশজুড়েই রাতভর যাত্রার প্রদর্শনী চলতো। তাছাড়া বিভিন্ন মেলা, উৎসবে যাত্রাপালার আয়োজন ছিলো অনিবার্য। তবে যাত্রাকে কখনোই চলচ্চিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হয়নি। বরং বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র ও যাত্রা দুটোতেই দর্শকের অংশগ্রহণ ছিলো। এই দশকে নতুন যে মাধ্যমটি চলা শুরু করেছিলো সেটা টেলিভিশন। ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকার ডিআইটি ভবনে টেলিভিশন যাত্রা[৮] শুরু

করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চ রামপুরায় 'বাংলাদেশ টেলিভিশন' এর নতুন কেন্দ্রে সম্প্রচার শুরু করে। এই সময়ে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহের রিলে স্টেশনের মাধ্যমে সম্প্রচার শুরু হয়। এর পর থেকে টেলিভিশন সেটের সংখ্যা বাড়তে থাকে। যদিও ১৯৬৫ সালেই টেলিভিশন সেটের সংখ্যা ছিলো এক হাজার ৪০০টি (Statistical Disest of Bangladesh 1973, p 157)।

দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্র হিসেবে পূর্ববাংলায় টেলিভিশন, প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সক্রিয় ছিলো। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তৎকালীন টেলিভিশন কেন্দ্র প্রতি মাসে চারটি করে বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত মাসে দুইটি এবং পরবর্তী সময়ে গড়ে প্রতি মাসে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে (*সাপ্তাহিক পূর্বাণী* ২১ অক্টোবর ১৯৮২)। স্বাধীনতার পর নিয়মিত প্রদর্শনীর বাইরে 'বিটিভি' ঈদের দিন, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ জাতীয় নানা দিবসে চলচ্চিত্র সম্প্রচার করতো। তবে 'বিটিভি' সম্প্রচারিত চলচ্চিত্রগুলো ছিলো অপেক্ষাকৃত পুরনো। 'বিটিভি'তে চলচ্চিত্র দেখালে সেটির বাজার খারাপ হবে, এই আশঙ্কায় নতুন চলচ্চিত্রের পরিবেশকরা 'বিটিভি'তে তা প্রদর্শনে আগ্রহী ছিলেন না। এছাড়া এজন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হতো তা দিয়ে কোনোভাবেই নতুন চলচ্চিত্র পাওয়া সম্ভব ছিলো না। "১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা কাহিনিচিত্রের জন্য সর্বোচ্চ ছয় হাজার টাকা দেওয়া হতো" (*সাপ্তাহিক পূর্বাণী*, ২১ অক্টোবর ১৯৮২)। সেই সময়ের টেলিভিশনের অবস্থা বর্ণনা করেন খুলনার 'সোসাইটি সিনেমা'র সুপারভাইজার মো. নাঈম। তিনি বলেন, 'তখন চ্যানেল ছিলো একটাই বিটিভি। একশো ঘর খুঁজলে একটাতে টেলিভিশন ছিলো। আমাদের এলাকায় সাদাকালো টেলিভিশন ছিলো একটা। তখন সপ্তাহে একটা নাটক হতো, সাপ্তাহিক নাটক। আর মাসে একবার ছায়াছবির গান। আর দুই–তিন মাসে রাতে একটা করে সিনেমা হতো। তারও নিশ্চয়তা ছিলো না, কবে হবে? মানুষের বিনোদনের ক্ষুধা তখন চরম।' তখন নারী দর্শকের প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ কম থাকায় টেলিভিশনের দর্শক হিসেবে তাদের সংখ্যা ছিলো বেশি। মফস্বল শহরগুলোতে এক বাড়িতে অনেক লোক একসঙ্গে টেলিভিশন দেখতো। মাসে যেদিন চলচ্চিত্র সম্প্রচার হতো সেদিন গ্রামে উৎসব লেগে যেতো!

১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে ওয়েজ আনার্স স্কিম[৯] চালু হওয়ার পর ধনাঢ্য ব্যক্তিরা রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ রেকর্ডার, টু ইন ওয়ান প্রভৃতি ইলেকট্রনিক্সের নাম দিয়ে নতুন যন্ত্র ভিসিআর আনতে শুরু করেন (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৬৪)। শুরুর দিকে অল্প পরিমাণ ভিসিআর বিমান ও নৌ পথে আনা হয়। ১৯৭৮ সালে ব্যাপক ভিত্তিতে ভিসিআর আমদানি করা হয় বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের যাত্রীবাহী জাহাজ 'হিজবুল বাহার' এর মাধ্যমে (*সাপ্তাহিক চিত্রালী* ২৩ অক্টোবর ১৯৮১)। এভাবে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখার বিপরীতে ভিসিআরে চলচ্চিত্র দেখার যাত্রা শুরু হয় এই দশকের শেষের দিকে। যার চরম প্রভাব পড়ে পরের দশকে।

৭০ দশকে সবচেয়ে আলোচিত পত্রিকার নাম 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'। ফজল শাহাবুদ্দীনের সম্পাদনায় দৈনিক বাংলা প্রকাশনী থেকে ১৯৭২ সালের ১৮ মে এটি প্রকাশ হয়। 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' সরাসরি চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা না হলেও চলচ্চিত্র নিয়ে এখানে যেসব আলোচনা হতো তা উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যশোরের 'মনিহার' সিনেমাহলের পাবলিসিটি বিভাগের প্রধান মোল্যা ফারুক আহম্মেদের সঙ্গে কথা হয় নীচতলার ক্যান্টিনে বসে। তিনি বলেন, "আগে প্রচার-প্রচারণার জন্য প্রধান দুটি মাধ্যম ছিলো, রেডিও আর 'ইত্তেফাক' পেপার। তখন সবাই 'ইত্তেফাক'-এ বিজ্ঞাপন দিতো। এছাড়া শুধু সিনেমার জন্য তখন দুটো পত্রিকা ছিলো 'চিত্রালী' ও 'পূর্বাণী'। এই দুটো পত্রিকার জন্য মানুষ আগ্রহ নিয়ে থাকতো। আর বেতারে এক সপ্তাহ আগে থেকে চলতো মুক্তি পাওয়া সিনেমার প্রচার-প্রচারণা।"

রঙ্গীন ছাপায় সাপ্তাহিক 'সিনেমা' প্রকাশ হয় ১৯৭২ সালের আগস্টে। এর প্রকাশক ছিলেন ফজলুল হক মনি। 'সিনেমা' শুরু থেকেই 'চিত্রালী'র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। পত্রিকাটি ৭৫-এর জুনে জারি করা সংবাদপত্র বাতিল

অধ্যাদেশের কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ৭০ দশকের মধ্যভাগে 'চলচ্চিত্র', 'চিত্রকল্প', 'নিপুণ', 'রংবেরং', 'চলচ্চিত্রিক', 'চলচ্চিত্রকার' নামে আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ হয়। এগুলোতে খবরের সঙ্গে মুক্তি পাওয়া চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হতো। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকের কাছে বিনোদনের এসব খবর খুব আগ্রহোদ্দীপক ছিলো। যশোরের 'তসবির মহল'-এর গেইটম্যান প্রহ্লাদ দাশ বলেন, 'সেই সময় শিক্ষিত মানুষরা সিনেমার পত্রিকা পড়েও বিনোদন নিতো। অনেকে পত্রিকার নায়ক-নায়িকাদের ছবি কেটে বাড়ির দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতো। আমিও অন্যদের কাছ থেকে সিনেমার পত্রিকা ধার করে এনে নায়ক-নায়িকাদের ছবি কেটে রাখতাম। তাদের নিয়ে নানা খবর নিয়েও সিনেমাহলে আলোচনা করতাম। সবমিলিয়ে সিনেমা নিয়ে তখন একটা অন্যরকম পরিবেশ ছিলো।'

মূলত "চলচ্চিত্র শিল্পের পুঁজিপতিদের সংগে তাই পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে সদ্ভাব রাখতে হয়। আবার দর্শকদের কাছে আগেভাগে ছবির খবর পৌঁছে দিয়ে ছবি সম্পর্কে তাদের কৌতুহলী করে তোলার শক্তিশালী মাধ্যম হল সংবাদপত্র। ... এই জন্যেই বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি গালগল্প চলচ্চিত্র সাপ্তাহিকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (মুৎসুদ্দী ১৯৮৭, পৃ১৩৫–১৩৬)" ছিলো। ফলে অনেকে সরাসরি প্রেক্ষাগৃহে না গিয়েও টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিনের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ পেয়েছিলো। এই সুযোগগুলো শহুরে মধ্যবিত্তকে চলচ্চিত্রে সম্পৃক্ত করতে বেশি ভূমিকা রাখতো।

**ভিসিআর আর টেলিভিশনের যৌথতার কাল**

চলচ্চিত্রের সমান্তরালে এই দশকে জোরালোভাবে পথচলা শুরু করে টেলিভিশন ও ভিসিআর। তবে চলচ্চিত্রের ওপর এই দুটি মাধ্যমের প্রভাব নিয়ে ভিন্ন মত আছে। কেউ মনে করেন ভিসিআর চলচ্চিত্রের ক্ষতি করেছে; কারো মতে করেনি। তবে টেলিভিশন এই দশকে চলচ্চিত্রের জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়িয়েছে বলে অনেকের মত। এই সময়ে ভিসিআরের ক্যাসেটে মূলত ভারতের হিন্দি ও বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র দেখা যেতো। এসব চলচ্চিত্র নিয়ে দর্শকের ব্যাপক আগ্রহও ছিলো। ভিসিআরের বদৌলতে তা দেখাও সহজ হয়ে গিয়েছিলো।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের পাশাপাশি একপর্যায়ে এফডিসি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রও ক্যাসেটে পাওয়া শুরু হয়। প্রথম দিকে পাইরেসির মাধ্যমে, পরে বৈধভাবেই এসব চলচ্চিত্র ক্যাসেট হয়ে দর্শকের কাছে পৌঁছাতো। এর প্রভাবও এফডিসি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের ওপর ছিলো। ৭০-এর দশকের শেষের দিকে ভিসিআর আমদানি ব্যাপকভাবে শুরু হয়। অবশ্য তখনো মধ্যবিত্তের ঘরে ভিসিআর আসেনি। ব্যবসায়িকভাবে ভিসিআরের শো চালানো হতো; অনেক দর্শক একসঙ্গে বসে সেখানে চলচ্চিত্র দেখতেন। সেই সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করেন কুষ্টিয়ার 'বনানী'র ব্যবস্থাপক মোখলেছুর রহমান বকুল। প্রথমে কোনোভাবেই বকুল কথা বলতে রাজি হচ্ছিলেন না। তার ভাষ্য, এসব কথা বলে কী হবে, আগের দিন তো আর ফেরত আসবে না। তারপরও সময় নিয়ে অনেক অনুরোধ করে কথা বলি তার সঙ্গে। বকুল বলেন, 'বাংলাদেশের সিনেমা ধ্বংস হয়েছে সেই ১৯৮৫ সাল থেকে; যখন এই দেশে ভিসিআর আসে। এর জন্য দায়ী ভারত। কারণ সে সময় ভিসিআরে দেখার জন্য বাংলাদেশের সিনেমা কম পাওয়া গেলেও ভারতীয় সিনেমার অভাব হতো না। ফলে মানুষ সিনেমাহল ছেড়ে ঘরে সিনেমা দেখা শুরু করে। সেই শুরু হলো, তার পরিণতি আজকের এ অবস্থা।'

রংপুরের 'শাপলা' সিনেমাহলের প্রতিনিধি রফিকুল বারী বলেন, 'প্রথমে সাদাকালো, পরে রঙ্গিন টেলিভিশন আসে ঘরে ঘরে। তারপর ভিসিআর, আরো পরে সিডি, ডিস আসে। মানুষ তখন ঘরে বসে সিনেমা দেখা শুরু করলো। মানুষ কিন্তু এখনও ঘরে বসে সারাদিন সিনেমা দেখে। তাহলে তারা বাইরে সিনেমা দেখতে আসবে কেনো!' অবশ্য যশোরের মোল্যা ফারুক কিছুটা ভিন্ন কথা বলেন, "আমরা যখন 'মণিহার'-এ ৮০ সালে চাকরি শুরু করি, তখন সিনেমা আর যাত্রা ছাড়া মানুষের বিনোদনের কোনো জায়গা ছিলো না। পরে

ভিসিআর আসতে থাকে। ফলে কিছু দর্শক ভিসিআরে সিনেমা দেখতো। তবে যেখানেই দেখুক তখনও সাধারণ মানুষের একমাত্র বিনোদনের জায়গা ছিলো সিনেমাহল। কিন্তু সেটা বেশি দিন থাকেনি।"

১৯৮০ সালে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ভিসিআরের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়। গবেষক মির্জা তারেকুল কাদেরের ভাষ্যমতে, এসব চলচ্চিত্রের বেশিরভাগই ছিলো হিন্দি এবং পর্নোগ্রাফি। ১৯৮০ সালের মধ্য ভাগে রাজস্ব বোর্ড ভিসিআরকে রাজস্বের আওতায় আনার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। এতে সাড়া দিয়ে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮০'র মধ্যে মাত্র ২৫ জন ভিসিআর সেট বৈধ করেন (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৬৫)। এর বাইরে সেসময় হাজার হাজার ভিসিআর সেট ছিলো। পরে সরকার এ নিয়ে কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি।

ফলে ঢাকাসহ মফস্বলেও বাণিজ্যিকভাবে ভিসিআরের প্রদর্শনী বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে এর পরিমাণ বাড়তে থাকে। 'মণিহার'-এর গেইটম্যান নজরুল ইসলাম সোহেল বলেন, 'ভিসিআর আসার পর সিনেমাহলের ব্যবসায় প্রথম সমস্যা দেখা দেয়। আমরা খেয়াল করতে থাকি দর্শক কিছুটা কমছে। সেসময় যশোরেও অনেক জায়গায় রাতে ভিসিআরের শো চলতো।' তবে একেবারে উল্টো কথা বলেন কুমিল্লার লাকসামের 'পলাশ সিনেমা'র তোফায়েল হোসেন, 'ভিসিআর তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে নাই। গ্রামে যখন ভিসিআরে সিনেমা দেখানো হতো, তখনো সিনেমাহলের কোনো সমস্যা হয় নাই। কারণ ভিসিআরে সিনেমা দেখে মন ভরতো না। সাধারণ মানুষ হয়তো মাঝে মধ্যে ভিসিআরে কিছু খারাপ সিনেমা দেখতে যেতো। কিন্তু তারা সিনেমাহলেও আসতো।'

১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ দেশে সামরিক শাসন জারি হলে ভিসিআরের বাণিজ্যিক প্রদর্শনী সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় (কাদের ১৯৯৩, পৃ ৪৬৫)। এ বছরের ২৬ জুলাই সামরিক আইনের ৭ নম্বর ধারায় বলা হয়, ২৪ আগস্টের মধ্যেভিসিআর সেট বৈধ করে নেওয়া যাবে (Marlial law Regulation 7, 1982)। ২৪ আগস্ট পর্যন্ত শুল্ক বিভাগ মোট ৫৭৭টি ভিসিআর সেট ও ২১০০ ভিডিও ক্যাসেটের ছাড়পত্র দেয় (*দৈনিক বাংলা* ২৫ আগস্ট ১৯৮২)। ৮২'র মার্চের পর ব্যাপক হারে বাণিজ্যিক প্রদর্শনী বন্ধ হলেও পুরনো ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য কিছু এলাকায় গোপনে ও প্রকাশ্য প্রদর্শনী অব্যাহত থাকে। এই পরিস্থিতি নিয়ে ১৯৮১ সালে করা আলমগীর কবিরের একটি মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ—"সবচাইতে রক্ষণশীল হিশেব মতেও বেআইনি ভিসিআর চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবসার শতকরা ত্রিশ ভাগ বা তার বেশি দর্শককে ইতিমধ্যে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ফলে বিনোদন কর বাবদ সরকার ইতিমধ্যে আনুমানিক দশ কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ভিসিআরের দৌরাত্ম এভাবে বাড়তে দেয়া হলে আগামী বছরে পনের থেকে বিশ কোটি টাকা হারাবেন। এই পরিমাণের ক্ষতি সহ্য করার মতো অবস্থা বাংলাদেশের আছে কিনা সরকার নিশ্চয়ই তা ভেবে দেখবেন" (কবির ২০১৮, পৃ ১৪৬–১৪৭)।

ফলে সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থে মানে ট্যাক্সের জন্য ভিসিআর নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা শুরু করে। ১৯৮২ সালের ২২ ডিসেম্বর ফিল্ম সেন্সরশিপ অ্যাক্ট ১৯৬৩ এবং সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট ১৯১৮ সংশোধন করে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশের অধীনে ভিসিআরের মাধ্যমে জনসমক্ষে চলচ্চিত্র প্রদর্শনকে বেআইনি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়।

এছাড়া ক্যাপাসিটি রুল (ভিডিও ক্যাসেট সপস্) ১৯৮৩-এর ৩ নং ধারানুসারে প্রতি বছরের জন্য প্রতিটি ভিডিও দোকানের সর্বনিম্ন কর নির্ধারণ করা হয়। নতুন অধ্যাদেশ জারির ফলে ভিসিআরের বাণিজ্যিক প্রদর্শনী অনেকখানি হ্রাস পায়। তারপরও ১৯৮৪ সালের শেষের দিকে ঢাকায় কমপক্ষে ১০টি বাণিজ্যিক ভিডিও সপ ও ভিডিও লাইব্রেরি ছিলো। ঢাকার পর ভিডিও ব্যবসা আস্তে আস্তে চট্টগ্রামে বিস্তৃত হয় (কাদের ১৯৯৩, পৃ ৪৬৬)। ১৯৮৫ সালে সরকার 'ভিডিও ক্যাসেট দোকান আইন ১৯৮৫' জারি করে। এই আইন অনুযায়ী যেকোনো নাগরিক লাইসেন্স নিয়ে সর্বনিম্ন ২৫০টি ক্যাসেট দিয়ে দোকান করতে পারবে। এজন্য একটি দোকানকে বছরে কমপক্ষে

২৫ হাজার টাকা কর দিতে হবে। এর মধ্য দিয়ে দেশে ভিডিও ব্যবসা স্বীকৃতি পায় (কাদের ১৯৯৩, পৃ ৪৬৬)। চট্টগ্রামের 'আলমাস'-এর ব্যবস্থাপক ও মুক্তিযোদ্ধা আবদুল আউয়াল বলেন, 'প্রথমে ভিসিআরের অনেক টাকা দাম হলেও পরে ক্যাসেট ও ভিসিআর সেট দুটোই সহজলভ্য হয়। যখন ভিসিআরের দাম কমে গেলো, ততোদিনে রিকশাওয়ালার বাড়িতে টেলিভিশন ঢুকে গেছে। ওই রিকশাওয়ালা কিন্তু সিনেমার দর্শক ছিলো। টেলিভিশনের দাম চার হাজার আর ভিসিআর সাত হাজার; মোট ১১ হাজার টাকা ইনভেস্টমেন্টে তারা ঘরে বসে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি সব সিনেমা দেখতে পেতো।'

খুলনার নাঈম বলেন, 'সিনেমা রিলিজ হওয়ার দুই–তিন মাসের মধ্যে তখন ওই সিনেমার পাইরেসি ক্যাসেটে পাওয়া যেতো। এক–দেড়শো টাকা দিয়ে ভিসিআর-টিভি ভাড়া করে লোকজন বাড়ি নিয়ে সিনেমা দেখতো।' পাইরেসি নিয়ে নাঈম বলেন, 'এই পাইরেসি বন্ধ করতে প্রত্যেক সিনেমার সঙ্গে ঢাকা থেকে তখন একজন করে লোক আসতো। সে অপারেটর রুমে বসে থাকতো। তারপর আইন-টাইনও হলো। দোকানে রেইড দিয়ে সব ক্যাসেট পুলিশ নিয়ে যেতো। এভাবে চললো কিছু দিন। তবে এটা ঠিক ভিসিআরে মানুষ সিনেমা দেখে আরাম পেতো না—কাঁপাকাপি, ফিতা আটকে যেতো।'

এই সময়ের মধ্যবিত্ত দর্শক কীভাবে ভিডিও ও টেলিভিশনে ঝুঁকে পড়লো তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আলমগীর কবির বলেন, "পঞ্চাশের চলচ্চিত্র দর্শকের একটি বিরাট অংশ ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। ষাটের দশকে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত দর্শককে মেসমেরাইজ করে তাড়াতাড়ি লগ্নি টাকার পাঁচ-সাত গুণ মুনাফার লোভে স্থানীয় চিত্রশিল্পে আমদানি করা হল এমনই সস্তা মালের (এছাড়া সঠিক পরিভাষা এই মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছি না), যা মধ্যবিত্ত দর্শককে সিনেমা হল থেকে তাড়িয়ে টেলিভিশনে পাঠিয়ে দিল। এই শ্রেণির দর্শক যাতে ভুলেও না আসে, সেজন্য প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশও করা হল দুর্বিসহ। টিকেটের কালোবাজারি, নোংরা পরিবেশ, ছেড়া কার্পেট, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলে টিকেটে অতিরিক্ত মাশুল নিয়েও শো চলাকালে এয়ারকন্ডিশন প্ল্যান্টটির সুইচ অফ করে দেয়া, দুর্গন্ধময় টয়লেট ইত্যাদি ইত্যাদি মারফত এই এককালের নিয়মিত দর্শকশ্রেণিকে নিশ্চিতভাবে তাড়িয়ে দেয়া হল" (কবির ২০১৮, পৃ ১৪৭)।

অবশ্য কবিরের এই যুক্তি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ৫০ ও ৬০-এর দশকে দর্শকের কাছে মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের মূল্যায়নের সুযোগই কম ছিলো। কারণ চলচ্চিত্রের যে প্রাযুক্তিক জাদুময়তা সেটা সেসময় সবকিছুকে ছাপিয়ে প্রাধান্য পেয়েছিলো। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তে খুব বেশি তফাৎ ছিলো না। ফলে তারা যেকোনো চলচ্চিত্রই দেখেছে। তবে ৭০ দশকের শেষের দিকে প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। তারপরও পরিবেশের কারণে বিশাল দর্শক প্রেক্ষাগৃহ ছেড়েছে, তাও খুব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মনে রাখতে হবে, ৮০'র দশকেই কিন্তু *বেদের মেয়ে জোস্‌না*র মতো ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র হয়েছে। দর্শক প্রেক্ষাগৃহে গিয়েই তা দেখেছে। তবে টেলিভিশনের প্রভাব ছিলো। খুলনার নাঈমের ভাষ্যে তার কিছু ইঙ্গিতও আছে—"মাঝে শুক্রবার বিকাল তিনটা থেকে সিনেমা দেওয়া শুরু হলো টিভিতে। যে শুক্রবার সিনেমা হতো সেদিন আমরা সিনেমাহলে এসে দেখতাম—আমার বাবা এই সিনেমাহলে ৪৫ বছর চাকরি করছে—লোকজন নাই। এমনকি সেদিন ছয়টার শোয়েও লোক হতো না। কারণ তিনটার সিনেমাটা টেনে ছয়টার পর নিয়ে যেতো। তখন আমরা এটা নিয়ে খুব টেনশনে পড়ে গেলাম। যারা ডিস্ট্রিবিউটর ছিলো, তারাও দেখলো শুক্রবারে বিক্রি কমে গেছে। আর সিনেমার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার আছে, যদি শুক্রবারে ভালো সেল না হয়, তাহলে সেটা আর কাভার করা যায় না। যে শুক্রবারে সিনেমা হতো আমরা আতঙ্কের মধ্যে থাকতাম।"

১৯৮৭ সালে সরকার চলচ্চিত্রের পাশাপাশি ভিডিও ক্যাসেটের সেন্সরশিপের জন্য ১৩ সদস্যের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে (*দৈনিক বাংলাবাজার*, ২৪ আগস্ট, ১৯৯২)। কিন্তু সেন্সর বোর্ড এনিয়ে কোনো তৎপরতা দেখায়নি। ফলে দেশের সবগুলো ভিডিও ক্লাবে 'অ্যাডাল্ট' চলচ্চিত্র সাজানো থাকতো। ১৯৮৯ সালের দিকে ঢাকায় ভিডিও ক্লাবের সংখ্যা ছিলো কমপক্ষে ৮০০টি (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৬৭)। এ বছরই প্রথমবারের মতো স্থানীয় চলচ্চিত্র আইনসম্মতভাবে ভিডিওতে বাজারজাতকরণ শুরু হয়। সবমিলে ভিসিআরের বিস্তৃতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। লাকসামের 'পলাশ'-এর ব্যবস্থাপক শামসুল ইসলাম বলেন, '৮৬'র পর থেকে ভিসিআরে লোকজন ভারতীয় বাংলা সিনেমা দেখতে থাকে। তখন গ্রামে ২১ ইঞ্চি টেলিভিশনে ভিসিআর দিয়ে রাতভর এসব সিনেমা দেখানো হতো। টিকিট কেটে এসব সিনেমা দেখতে হতো। এতে সরকারের ক্ষতি হয়েছে, কারণ তারা কোনো ট্যাক্স পায়নি।'

এই দশকে আরেকটি ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ, ১৯৮০ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে 'বিটিভি'তে শতকরা ১০০ ভাগ অনুষ্ঠান রঙ্গিন সম্প্রচার হতে থাকে। ১৯৮১ সালে পাঁচ হাজার রঙ্গিন টেলিভিশন সেটসহ দেশে টেলিভিশনের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় এক লাখ পাঁচ হাজার ৫৫২টি (Television Research Study 1982, p85)। টেলিভিশন সেটের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশ 'বিটিভি'র পরিধি বেড়েছে। ফলে একই সঙ্গে সারাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দর্শক ঘরে বসে টেলিভিশনে চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ পেতে থাকে। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত 'বিটিভি' তার সর্বমোট সম্প্রচার ঘণ্টার ২১ শতাংশ চলচ্চিত্র দেখিয়েছে (BTV Profile, 1989)।

**ভিসিআরের জায়গায় সিডি সঙ্গে রঙিন টেলিভিশন**

৮০'র দশকে ভিসিআরের যে প্রভাব ছিলো, ৯০ দশকে তা খুব বেশি কমেনি। প্রাযুক্তিক বিবর্তনে তার সঙ্গে যুক্ত হয় কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি) প্লেয়ার; রঙিন টেলিভিশন সেটের পরিমাণ বাড়ে, যোগ হয় ডিস অ্যান্টেনা। সবগুলোর কমবেশি প্রভাব চলচ্চিত্রের ওপর ছিলো। ১৯৯১-এ মুক্তি পায় এহতেশাম পরিচালিত *চাঁদনী*। শাবনাজ, নাঈম জুটির এই চলচ্চিত্রটি টিনএজ ছেলেমেয়েদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এরই ধারাবাহিকতায় সালমান শাহ্, মৌসুমী, শাবনূর জনপ্রিয় হন। টিনএজ ছেলেমেয়েরা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে শাবনাজ, নাঈম, সালমান শাহ্, মৌসুমী, শাবনূর, মান্নার চলচ্চিত্র যেমন দেখেছে, আবার পাড়ায় চলা ভিসিআরে দেখেছে হিন্দি চলচ্চিত্র আর পর্নোগ্রাফি।

ফলে প্রেক্ষাগৃহ একধরনের আর ভিসিআর আরেক ধরনের বিনোদন চাহিদা মিটিয়েছে। ঢাকা শহরসহ দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে গড়ে ওঠা ব্যাচেলর ও ছাত্র মেসগুলো সুযোগ পেলেই পুরো রাতের জন্য রঙিন টিভিসহ ভিসিআর ভাড়া করে হিন্দি চলচ্চিত্র ও পর্নোগ্রাফি দেখতো। মেসগুলোতে সদস্যদের সম্মিলিত চাঁদার টাকায় পর্নোগ্রাফি দেখাই ছিলো ভিসিআর ভাড়ার প্রধান কারণ। ৯০ দশকে গ্রামের দিকেও ভিসিআর ভাড়া শুরু হয়। গ্রামে অবশ্য ভাষার কারণে ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্রগুলো বেশি জনপ্রিয় ছিলো। সন্ধ্যার দিকে বাড়ির বড়ো-ছোটো সবাই মিলে ভিসিআর দেখা হলেও, রাত বাড়তেই এর দখল নিতো যুবকরা; তখন তারা মূলত পর্নোগ্রাফি-ই দেখতো।

রঙিন টেলিভিশনের কারণেই ভিসিআরের চাহিদা এই দশকে বেড়ে গিয়েছিলো। কারণ বাস্তবের কাছাকাছি দেখানোর ক্ষমতা রঙিন টেলিভিশনের ছিলো। ফলে সাদাকালো টেলিভিশন দেখা দর্শকের কাছে এটা ছিলো একধরনের জাদুময়তা। ১৯৯২ সালের জানুয়ারির পরিসংখ্যান মোতাবেক, মোট ছয় লাখ ৩৭ হাজার ২৭২টি টেলিভিশন সেট ছিলো। এর মধ্যে সাদাকালো সেট চার লাখ ৫৯ হাজার ৩৬৭টি এবং রঙিন এক লাখ ৭৭ হাজার ৯০৫টি (কাদের ১৯৯৩, পৃ ৪৫৬)।

১৯৯১ সালের শুরুতে দেশে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯২–১৯৯৩ সালে চালু হয় সিএনএন ও বিবিসি'র সম্প্রচার। আরো পরের দিকে ভারতের স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো ডিশ ব্যবসায়ীদের কল্যাণে জনপ্রিয় হয়, বিশেষত মধ্যবিত্ত দর্শকের মধ্যে। যারা প্রকৃত অর্থে ছিলেন চলচ্চিত্রের দর্শক। "সত্তর দশকের শেষদিকে পুরান ঢাকার বেগমবাজার, সিদ্দিকবাজারসহ কোনো কোনো পাড়ায় ১০ থেকে ৫০ টাকা দিয়ে কেনা ভিসিআরে দেখা *শোলে* আর *মুদাদ্দার কি সিকান্দার* অনেক ঝকঝকে রূপ নিয়ে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর কল্যাণে যেন ঘরে ঘরেই পৌঁছে গেল তখন" (আহমেদ ২০১৮, পৃ১১৩–১১৪)। তবে গ্রামে স্যাটেলাইট টেলিভিশন আসতে আরো সময় লেগেছে। সাতক্ষীরার দেবাহাটার 'লাইটহাউজ'-এর দর্শক আফজাল হোসেনের ভাষ্যে তা জানা যায়—"রঙিন টেলিভিশন আর ডিসলাইন অন্যরকম জিনিস! প্রথমে এটা আমরা বুঝতে পারি নাই। তখন সাতক্ষীরা শহরে যারা থাকতো তাদের কাছে কেবল গল্প শুনতাম। ওরা বলতো, বড়ো একটা অ্যান্টেনা লাগাতে হয়; সারাদিন হিন্দি গান আর সিনেমা চলে। আমাদের দেবাহাটায় অবশ্য অনেক পরে এটা আসছে, এর আগে আমরা ভিসিআরে সিনেমা দেখতাম আর 'ইছামতি' সিনেমাহলে যেতাম।"

আসলে মাধ্যম হিসেবে দর্শককে ধরে রাখার কিংবা দর্শকের সঙ্গে থাকার এক অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে টেলিভিশনের। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রশিক্ষক, তাত্ত্বিক গাস্তঁ রোবের্জ এর ভাষ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ—"টেলিভিশন আমার কাছেও আসে না, আমাকে টেনেও নিয়ে যায় না। সে শুধু আছে। তা শুধুই উপর-ভাসা ছবি, আমি যোগ দিলাম কি না দিলাম, তাতে তার কিছু এসে যায় না; এমন কি আমি আছি না আছি তাতেও তার কিছু এসে যায় না। টিভির ছবি একাই নিজের মত দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে চলে। উপস্থাপনের সময়েই কোনও দর্শক নেই, এমন মঞ্চনাটকের কল্পনা করা যায় না। চলচ্চিত্রেরও দর্শকের প্রয়োজন, যদিও দর্শকের উপস্থিতি হতে পারে নানা স্থানে, নানা সময়ে। কিন্তু টেলিভিশন সর্বদাই আছে। বিদ্যুৎ-সরবরাহের মতই, আপনি প্লা করুন বা নাই করুন, টিভি হাজির" (রোবের্জ ২০০৪, পৃ ১৩৯)। দর্শকের সঙ্গে জোকের মতো লেগে থাকা এই যন্ত্রটিতে যখন চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়, তখন তা প্রেক্ষাগৃহে দেখানো চলচ্চিত্রের ওপর প্রভাব ফেলে।

এদিকে প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে কিছু দিনের মধ্যে সিডি প্লেয়ার চলে আসে। ভিসিআরের একটা বড়ো সমস্যা ছিলো, এর ক্যাসেট অনেকবার ব্যবহারের কারণে পর্দায় ছবির মান খুব ভালো হতো না। অনেক সময় টেলিভিশনের পর্দা ঝিরঝির করতো, কাঁপতো, শব্দের সমস্যা হতো। কিন্তু সিডি আসার পর ছবির মানে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। ঝকঝকে ছবি দেখা যায়! সঙ্গে রঙিন টেলিভিশন থাকায় তা একধরনের স্বপ্নময় পরিস্থিতি তৈরি করে। এই পরিস্থিতির বর্ণনা পাওয়া যায় খুলনার নাঈমের কথায়—'এরপর আসলো সিডি। আমরা টেনশনে পড়ে গেলাম। সিডি তো আরেক ভয়ানক জিনিস, কাচের মতো স্বচ্ছ ছবি দেখা যায়। সিডির দামও হয়ে গেলো তিন–চার হাজার টাকা। সবাই কেনা শুরু করলো। এদিকে কিন্তু আমাদের ব্যবসা ডিমোশন হচ্ছে; লোকজন কমতে শুরু করেছে। রঙ্গিন টিভির দামও কমে গেলো। সবাই টিভি, সিডি এক সঙ্গে কেনা শুরু করলো।' নাঈম আরো বলেন, 'আরো কিছু দিন পর কেবল অপারেটররা করলো কী, কম্পিউটারের সাহায্যে স্থানীয়ভাবে একটা চ্যানেলে সব সময় বাংলা সিনেমা চালানো শুরু করলো। আমরা তো কমপ্লেইন করলাম, আপনারা যে সিনেমাই দেন, বাংলা সিনেমা দেওয়া যাবে না। ওরা তখন বাংলা সিনেমা দেওয়া বন্ধ করলো।'

একদিকে সিডি, অন্যদিকে রঙিন টেলিভিশন সব মিলিয়ে চলচ্চিত্রের ওপর চাপটা বাড়তে থাকে। আর প্রতিযোগিতা না থাকায় ঢাকাই চলচ্চিত্রের মানও যে খুব বেশি বেড়েছিলো এমন নয়। ফলে "টিকে থাকার তাগিদে [চলচ্চিত্র] ইন্ডাস্ট্রির লোকজন এবার ভারতীয় ছবিরই পুনরুৎপাদনের কথা ভাবতে থাকেন" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ ৬৫)। ফলে চলচ্চিত্রে সংকট আরো ঘনীভূত হয়।

৯০ দশকে প্রকাশিত পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোর বিনোদন ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এসব পত্রিকা থেকে দর্শক নায়ক-নায়িকার গসিপ, নতুন ও বিদেশী চলচ্চিত্রের খবর জানতো। স্যাটেলাইটের কারণে বিদেশী চলচ্চিত্র সম্পর্কিত তথ্য তখন পাঠক-দর্শকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে শুরু করে। ১৯৯২-এ প্রকাশ হয়

পাক্ষিক 'তারকা কাগজ'। পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। পরের বছর প্রকাশ হয় 'টেলিভিশন'। ১৯৯৬-এ 'অন্যদিন' ও 'আনন্দ ভুবন'। ১৯৯৮-এ 'বিনোদন বিচিত্রা'। এই তিনটি পত্রিকায় টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ছাড়াও ফ্যাশন ও লাইফ স্টাইল বিষয়ক আধেয় প্রকাশ করতো। মধ্যবিত্তের বসার ঘরে নিয়মিতই পত্রিকাগুলো দেখা যেতো। বসার ঘরে থাকা টেলিভিশন সেটটি এবং সোফার সেন্টার টেবিলে থাকা পত্রিকা/ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে একটা সুতোবিহীন সম্পর্ক ছিলো। যে সম্পর্ক টেলিভিশনের দর্শক হিসেবে তাদের প্রভাবিত করতো।

**শূন্য দশক : এক নতুন সময়**

১৯৯২–১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে যেখানে ১০টি আন্তর্জাতিক চ্যানেল দেখার সুযোগ ছিলো, ২০০১-এ এই সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়ে যায়। ২০১৬ তে এই সংখ্যা হয় শতাধিক (কাদের ও সিদ্দিক, *প্রথম আলো* ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬)। এসব চ্যানেলে সম্প্রচারিত চলচ্চিত্র, নাটক, সোপ অপেরা[১০], বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান দর্শক নিয়মিতই দেখতে থাকে। এর বাইরে শুধু চলচ্চিত্র দেখানোর জন্য কেবল অপারেটররা স্থানীয়ভাবে চ্যানেল চালু করে। শ্রীমঙ্গলের 'রাধানাথ সিনেমা'র সুপারভাইজার জহির খন্দকার বলেন, 'এই শ্রীমঙ্গলে ডিসের চারটা লোকাল চ্যানেল আছে, তারা প্রত্যেক দিন সিনেমা দেখায়। অনেক সময় নতুন নতুন সিনেমাও দেখায়। তাহলে দর্শক এই নোংরা, গন্ধওয়ালা সিনেমাহলে টাকা খরচ করে আসবে কেনো!' কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার বন্ধ হয়ে যাওয়া 'রূপাঞ্জলী সিনেমা'র ব্যবস্থাপক উমর আলী বলেন, 'ভারতের সিরিয়াল যেনো সবাই রুটিন করে দেখে; মনে হয় ক্লাস করতেছে। তার ওপর আছে মোবাইল ফোন, সবাই তিন–চারটা করে সিনেমা নিয়ে ঘোরে। তাহলে সিনেমাহলে কখন যাবে!' নওগাঁর পত্নীতলার 'রংধনু'র দর্শক আবদুর রহমান বলেন, 'আগে মাসে একটা করে সিনেমা দেখানো হতো বিটিভিতে, তার পর সপ্তাহে একটা করে দেখানো শুরু হলো। এরপর প্রতিদিন একটা করে হতো। আর এখন তো টেলিভিশনে সারা দিন সিনেমা হয়। তাই সিনেমাহলে মানুষ নাই। এখন লোকজনের আগ্রহ গাঁজা, হিরোইন, ফেন্সিডিল, মদ এগুলার দিকে।'

বিশেষ করে ভারতীয় কয়েকটি চ্যানেলে সারাদিনই হিন্দি ও বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র সম্প্রচার হতে থাকে। কোনো চলচ্চিত্র পছন্দ না হলে মুহূর্তে অন্যটি দেখার সুযোগ আছে। এছাড়া যে নারী দর্শক নানা কারণে প্রেক্ষাগৃহে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো, তাদের বিনোদনে নতুন উপাদান হিসেবে যোগ হয় ভারতীয় ডেইলি সোপ অপেরা। তবে নেত্রকোণার 'হিরামন'-এর ব্যবস্থাপক পরিতোষ সাহা মনে করেন, "ডিস আসার পর সিনেমার ওপর তেমন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু ভারতীয় চ্যানেল 'স্টার প্লাস', 'স্টার জলসা', 'জি বাংলা' এসে সব শেষ হয়ে গেলো।" যশোরের 'মণিহার'-এর ডিসির গেইটম্যান শহিদুল ইসলাম বলেন, 'টেলিভিশনে যে সিরিয়ালগুলো হয়, এগুলো দেখার পর সিনেমাহলে আসার কোনো প্রশ্নই আসে না। সন্ধ্যা থেকে এমনভাবে সিরিয়াল শুরু হয়, দর্শক আটকে যায়। আগে ইভিনিং শোয়ে প্রচুর দর্শক হতো। এখন সিরিয়াল সেই দর্শককে আটকে রাখে। সেজন্য পরিবার নিয়ে আসা দর্শক আর এখন পাওয়া যাচ্ছে না।'

৮০ ও ৯০ দশকে 'বিটিভি'তে সপ্তাহে বিশেষ দিনের ধারাবাহিক নাটক খুবই জনপ্রিয় ছিলো। দর্শক ওই নাটক দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে থাকতো সারা সপ্তাহ। এবং প্রতি সপ্তাহে নাটকটি এমন পরিস্থিতিতে শেষ হতো যেনো পরের সপ্তাহে দর্শকের আগ্রহ থাকে। বিটিভি'র সেই ধারাবাহিক নাটকগুলো, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চালুর পর তাদের কব্জায় চলে যায়। বিশেষ করে 'একুশে টেলিভিশন' দীর্ঘ সময় নিয়ে ধারাবাহিক নাটক সম্প্রচার করতে থাকে। সেগুলো খুব জনপ্রিয়ও হয়। কিন্তু বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধারাবাহিক নাটকের মানও কমতে শুরু করে। বরিশালে 'অভিরুচি'র পাবলিসিটি কর্মী শেখ মাসুম ক্ষোভ নিয়ে বলেন, 'এখন ঘরে ঘরে টেলিভিশন ও ডিসের লাইন। সারা দিন ভারতীয় চ্যানেল চলে; অথচ আমাদের চ্যানেলগুলোতে যে নাটক হয়; সেটা কেউ দেখে না। আমাদের

নাটকের কাহিনি এতো সুন্দর, অথচ সিনেমার কোনো কাহিনি নাই। নাটকের কাহিনি নিয়েও যদি সিনেমা হতো, তাহলেও অনেক লোক দেখতে আসতো।'

শূন্য দশকের মাঝামাঝি থেকে দেশে চালু থাকা ভারতীয় চ্যানেলগুলোতে সোপ অপেরা জনপ্রিয় হতে থাকে। প্রথম দিকে 'সনি টিভি'তে হিন্দিতে সম্প্রচারিত সোপ অপেরাগুলো জনপ্রিয় হয়। মূলত হিন্দি ভাষা বেশি মানুষ না বোঝায়, শহরে এগুলো জনপ্রিয় ছিলো। পরে কলকাতাভিত্তিক চ্যানেলগুলো বাংলায় সোপ অপেরা নির্মাণ শুরু করে। সাধারণত পারিবারিক জটিলতা, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, বউ-শ্বাশুড়ির দ্বন্দ্ব, পরকীয়া প্রেম, পৌরাণিক কাহিনি, রূপকথার গল্প নিয়ে সোপ অপেরাগুলো নির্মাণ হতে থাকে। বরিশালের 'অভিরুচি'র পয়েন্টম্যান আ. মালেক বলেন, "যতো ভালো সিনেমাই আসুক লোক আসবে কেনো, এখন সবাই ইন্টারনেটে, মোবাইলে সিনেমা দেখে, মহিলারা তো সারাদিন দেখে 'স্টার জলসা'। সেখানে একই কাহিনি ঘুরে ঘুরে দেখায়। আর সব কাহিনিতেই পরকীয়া প্রেম আছেই। মহিলা-পুরুষরা এখন কেউ দেশের কোনো চ্যানেল দেখে না।" যশোরের 'তসবির মহল'-এর ব্যবস্থাপক আলী হোসেন নদু বলেন, 'আমার তো মনে হয় ডিসলাইনের কারণেই এরকম হয়েছে। ডিসলাইন আগে ছিলো শহরে, আর এখন গ্রামে চলে গেছে। সিনেমাহলের দর্শকের অনেকে এখন ভারতের চ্যানেলে নাটক, সিনেমা দেখে। তবে মোবাইলের মেমোরি কার্ডও খুব ক্ষতি করেছে। একটা মেমোরি কার্ডে অনেক কিছু নেওয়া যায়। শ্রমিকরা কাজ করতেছে আর মোবাইলে গান শুনতেছে। কাজ না থাকলে ওখানেই আবার সিনেমা দেখতেছে।'

বরিশালের 'অভিরুচি'র মালিক এবায়দুল হক চাঁন বলেন, 'যখন একজন লোক ১০ মিনিট চায়ের দোকানে বসে চা খায়, একই সঙ্গে সে টেলিভিশনে সিনেমাও দেখে। ওই লোক সারাদিনে দুই কাপ চা খাওয়ার সময়ের মধ্যেই বিনোদন নিয়ে নেয়। ফলে আলাদাভাবে টাকা খরচ করে কেনো তারা সিনেমাহলে আসবে!' যশোরের দর্শক রবিউল আলম ক্ষোভ নিয়ে বলেন, 'দীর্ঘ দিন বাংলাদেশের সিনেমার কোনো উন্নতি দেখি না। মাঝে মাঝে মনে হয় সরকার যদি ভারতীয় কয়েকটা চ্যানেল বন্ধ করে দিতো, তাহলে বোধ হয় কিছু হতো।' তবে কুড়িগ্রামের 'স্বর্ণমহল'-এর অপারেটর বিজয় অধিকারী বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন অন্যভাবে—'মানুষের জন্য বিনোদন থাকাটা খুব জরুরি। সেটা হারিয়ে গেছে। সিনেমাহলে সিনেমা দেখার একটা আলাদা মজা আছে। সেটা একা একা দেখলে পাওয়া যায় না। মানুষ যদি সিনেমাহলে এসে এই মজা না নিতে পারে, তাহলে দেশের অনেক ক্ষতি হবে। কারণ এসব সিনেমার মধ্যে অনেক জ্ঞান আছে। একই সঙ্গে আনন্দও আছে।'

শূন্য দশকের শেষের দিকে টেলিভিশনের পাশাপাশি কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব ও স্মার্ট মোবাইল ফোনসেট অন্যান্য কাজের সঙ্গে বিনোদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। কুষ্টিয়া সদরের মোখলেছুর রহমান বকুল বলেন, 'দিনে দিনে মনে হচ্ছে, মানুষের মন থেকে বিনোদন উঠে যাচ্ছে। তার কারণ প্রথমত ডিসলাইন, তারপর মোবাইলফোন। এখন আর ভিসিআর, সিডি, ডিভিডি নাই; সবার হাতে বড়ো বড়ো মোবাইল ফোন, সেখানেই সবাই সবকিছু দেখছে।' যশোরের শিক্ষার্থী 'মণিহার'-এর দর্শক রাকিব বলেন, 'ইন্টারনেটের কারণে বেশিরভাগ সিনেমা দর্শক সিনেমাহলে না এসেই সব দেখতে পারছে। অনেক গানও আগেই দেখে ফেলছে, তাই সিনেমার প্রতি আগ্রহ কমে গেছে। তবে আমার মোবাইলফোনে সিনেমা দেখতে কিন্তু ভালো লাগে না।' কুড়িগ্রামের 'মিতালী সিনেমা'র পাশের ভিডিও দোকানদার নয়ন একেবারে ভিন্ন কথা বলেন, 'মোবাইলে আর সিনেমাহলে সিনেমা দেখার অনেক পার্থক্য। এখন হয়তো অনেকে টাইম পাসের জন্য মোবাইলে সিনেমা দেখে, কিন্তু এখনো অনেক লোক আছে যারা ভালো পরিবেশ পেলে সিনেমাহলে সিনেমা দেখবে।' যশোরের মণিহারের সামনের দোকানি জুয়েল হোসেন বলেন, 'এখন মানুষের হাতে হাতে সিনেমাহল। তাই দর্শকের আর সিনেমাহলে আসার দরকার পড়ে না। তারপরও ভালো সিনেমা হলে দর্শক দেখে। কারণ সিনেমাহলে সিনেমা

দেখার আনন্দই আলাদা।' নওগাঁর পত্নীতলার 'বিনোদন সিনেমা'র কর্মচারী মিলন কুমার মণ্ডল বলেন, 'সিডি খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে নাই। স্মার্ট মোবাইলফোন আসার পর থেকে ব্যবসাটায় বড়ো ধরনের ধস দেখা দিয়েছে।' 'বিনোদন'-এর আইসক্রিম বিক্রেতা ফিরোজ মিয়ার সঙ্গে কথা হয় প্রেক্ষাগৃহের সামনের বাজারে। বিষণ্ন মুখে তিনি বসেছিলেন। ফিরোজ বলেন, 'লোকজনের আর কী দোষ বলেন; তারা ১০ টাকা দিয়ে মোবাইলে পাঁচটা সিনেমা তুলে বাড়ি নিয়ে সারারাত দেখতেছে। এতো টাকা দিয়ে সিনেমাহলে এসে সিনেমা দেখার চেয়ে ঘরের ভেতর কাঁথার নীচে বসে সিনেমা দেখা অনেক ভালো।'

ল্যাপটপ, মোবাইল ফোনসেট আর ট্যাবের সুবিধা হলো, যে কেউ শুয়ে, বসে, কিংবা বাসে-ট্রেনে ভ্রমণের সময় চাইলেই এসব ডিভাইসে চলচ্চিত্র দেখতে পারে। এছাড়া একই বাড়িতে এখন টেলিভিশন, কম্পিউটারের সংখ্যাও একের অধিক। বাড়ির প্রত্যেকে নিজের মতো করে এসব যন্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। চট্টগ্রামের আবদুল আউয়াল বলেন, 'এটা ঠিক তখন [৬০ এর দশকে] সিনেমা ছাড়া মানুষের বিনোদনের আর কোনো মাধ্যম ছিলো না। এখন এক বাড়িতে তিনটা ঘর থাকলে সবগুলোতেই টেলিভিশন আছে। অবশ্য এখন অনেকে টেলিভিশনও দেখে না; তারা ল্যাপটপ, মোবাইলে সব দেখে।' কুড়িগ্রামের স্বর্ণমহল-এর কিনু বাবু বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন খানিকটা অন্যভাবে—'এখন ঢাকায় সিনেমা মুক্তি পেলে দুই-চার দিনের মধ্যে কীভাবে যেনো পাইরেসি হয়ে যায়। তারপর তা পাওয়া যায় সবার ফোনে ফোনে। মোবাইল ফোনে মানুষ টানা সিনেমা দেখে না। আধা ঘণ্টা দেখার পর হয়তো কেউ কোনো কাজ করলো, আবার ফাঁকা হলে দেখলো। ফলে দর্শকের ওপর কোনো চাপ থাকে না।'

সম্প্রতি স্মার্ট মোবাইল ফোনসেটের দাম অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় আগের তুলনায় ফোনসেটের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। বিনোদনের অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে এসব মোবাইল ফোনসেট। সঙ্গে ইন্টারনেট সংযোগও অনেক সস্তা ও সহজ হয়ে এসেছে। ময়মনসিংহের 'ছায়াবাণী'র দর্শক সাখাওয়াত আলী শিবলি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী। বান্ধবীকে নিয়ে তিনি প্রেক্ষাগৃহে এসেছেন। শিবলি দর্শকের প্রেক্ষাগৃহ বিমুখতার ব্যাখ্যা করেন অন্যভাবে—'কোনো মানুষ যদি রিচ ফুডের সন্ধান পেয়ে যায়, তখন তার কাছে মাছ-ভাত খুব বেশি আর ভালো লাগে না। এখন প্রযুক্তির বদৌলতে আমরা নিমেষেই হলিউড, বলিউডের সিনেমা দেখতে পারি। সেই সিনেমার তুলনায় আমাদের সিনেমা কিছুই না। ওইসব সিনেমার কাহিনি, অ্যাকশন ও কারিগরি নানা দিকের তুলনায় আমাদের সিনেমা অত্যন্ত দুর্বল। সেই জন্য তরুণ প্রজন্মকে এই সিনেমা মোটেও টানতে পারছে না।' একই ধরনের কথা বলেন খুলনার 'সোসাইটি সিনেমা'র মালিক জাফর আলী বলেন, 'আপনি কী চান, মোবাইলে তাই পাবেন। ছেলেরা ন্যাংটা সিনেমা নিয়ে ঘোরে। তাহলে কেনো আসবে সিনেমাহলে মানুষ! সিনেমাহলে ওই মানুষকে আনতে গেলে ওর চেয়ে ভালো কিছু দেখাতে হবে। কিন্তু সেটাতো তারা পারছে না।' চট্টগ্রামের 'দিনার'-এর গেইটম্যান আমির হামজা বলেন, 'মোবাইল ফোন আসার পর অনেকগুলো জিনিস ধ্বংস হয়ে গেছে। মোবাইল ডাক বিভাগ, টেলিফোন, ছবি তোলার স্টুডিও ধ্বংস করছে। অন্যদিকে স্মার্ট মোবাইলফোন আর ডিসলাইন মিলে ধ্বংস করছে সিনেমাহলগুলো।' নওগাঁর 'বিনোদন'-এর সমীর কুমার মণ্ডল বলেন, 'ডিশ আসার পরও আমরা অনেক যুদ্ধ করেছি, কিন্তু ফোনের মেমোরি কার্ডের সঙ্গে আর পারলাম না। আর সিনেমাগুলোও এমন হলো, মেয়ে-ছেলেরা দেখলো না। তাদেরকে সিনেমাহল ছাড়তে বাধ্য করা হলো আরকি।'

তবে খুলনার 'সোসাইটি সিনেমা'র হিসাবরক্ষক মো. নাসিম একেবারে অন্য যুক্তি দেন—'অনেকে বলে ডিস, মেমোরির কারণে সিনেমা চলছে না। এটা ভুল কথা। তাহলে *শিকারী*, *বাদশা* এই সিনেমাগুলো ব্যবসা করলো কেনো?' ময়মনসিংহের 'ছায়াবাণী'র অপারেটর মো. সুমন বলেন, 'মোবাইল ফোনের মেমোরি কার্ড মোটেও সমস্যা নয়। কারণ মেমোরি কার্ড আসছে পাঁচ–ছয় বছর হলো। কিন্তু তার আগে থেকেই সিনেমার অবস্থা

খারাপ।' যশোরের 'মণিহার'-এর কর্মচারী শওকত আলী মনে করেন, 'ভারতেও ইন্টারনেট আছে, কিন্তু ওদের আলাদা সিস্টেম। ওখানকার পরিচালকরা মিউজিকের ওপর জোর দেয়। কিন্তু বাংলাদেশে সেটা নাই। এটা মুসলমানের দেশ। এখানে দর্শক একটু আলাদা।' নাসিম, সুমন ও শওকত আলীর কথায় যুক্তি আছে। মেমোরিকার্ড আসার আগে থেকেই চলচ্চিত্রের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। বিশেষ করে ৯০ দশকের শেষের দিকে চলচ্চিত্রে সহিংসতা ও যৌনতা আসতে থাকে। ভালো কাহিনি নির্মাণের বিপরীতে এগুলো দিয়ে নির্মাতা-প্রযোজকরা দর্শককে আকর্ষণের চেষ্টা করেন।

আবার নানা কারণেই যারা সরাসরি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন না, তারা ডাউনলোড করা চলচ্চিত্র, গান, নাটক দোকান থেকে স্মার্ট ফোনসেটে ভরে নিয়ে দেখছে। খুলনার 'শঙ্খ'-এর দর্শক বর্ষা বলেন, 'বাংলাদেশের সিনেমা আমার ভালো লাগে। তবে সিনেমাহলে খুব বেশি আসা হয় না। বেশিরভাগ সময় দোকান থেকে নিয়ে ফোনে দেখি। ভারতের সিনেমাও দেখি। ওইসব সিনেমার কাহিনি দারুণ!' এসব নিয়ে কুড়িগ্রামের ভিডিও দোকানদার নয়ন বলেন, 'প্রথম প্রথম স্মার্টফোন আসলো তখন পর্নোগ্রাফির চাহিদা খুব ছিলো। কিন্তু এখন একটু কম। এর কারণ আমি ঠিক জানি না। তবে এখন হিন্দি, এমনকি বাংলা আইটেম গানগুলো ভালো চলে। বাংলাদেশে বিপাশা নামে একটা মেয়ে আইটেম গান করে, ওর বেশ চাহিদা।'

বর্তমানে স্যাটেলাইট চ্যানেল, টেলিভিশনের চেয়েও মাধ্যম হিসেবে অনেক বেশি সহজলভ্য হয়ে গেছে স্মার্ট মোবাইল ফোনসেট। কৃষক, রিকশাওয়ালা, দোকানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বিনোদনের জন্য ফোনসেটের ওপর নির্ভর করছে। নওগাঁর 'বিনোদন'-এর মালিক আমিনুল ইমলাম বলেন, 'দর্শকের কোনো দোষ নাই। প্রতিদিন দর্শক কোনো না কোনোভাবে সিনেমা দেখছেই। দর্শক সিনেমাহলের বাইরে বিনোদনের বিকল্প মাধ্যম খুঁজে নিচ্ছে। এটা তারা কখন করছে, যখন এই সিনেমা থেকে তারা হতাশ হয়েছে।'

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড়ো যে সমস্যাটি দেখা দিয়েছে, তা হলো মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের যে জাদুময়তা তা নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিশেষ শব্দে বিশাল পর্দায় চলচ্চিত্র যে বাস্তবতা নির্মাণ করতো, সেটা আর এই ১২/১৪ ইঞ্চি কিংবা তার চেয়ে আরো ছোটো মনিটরে বোঝা সম্ভব নয়। কিংবা পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে থেকে একাগ্রচিত্তে চলচ্চিত্র দেখাও সম্ভব হয় না অনেকের পক্ষে। কবি, সাংবাদিক আবুল মোমেন বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—"প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র দেখার একটা মস্ত বড় প্রাপ্তি হলো, একসঙ্গে বহু মানুষ মিলে আবেগ-অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া-ভাবনা এবং স্মৃতির ঐক্যে এক নান্দনিক আনন্দের বন্ধন। বহু মানুষের চিন্তা ও কল্পজগৎ এবং রুচি ও নান্দনিক বোধের যৌথ রসায়ন ঘটিয়ে সমাজে সমরুচি ও সমনান্দনিকতার পরিবেশ তৈরি হয় এভাবে। ঘরে বসে নিজের টিভিতে নাটক/চলচ্চিত্র দেখার দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে মানুষ হয়ে পড়ছে exclusivist—নিতান্ত আপনাতে আবদ্ধ মানুষ" (মোমেন, *প্রথম আলো* ২২ মে ২০১০)। ফলে দিনের পর চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তা চলচ্চিত্রকে দর্শক কতোখানি উপভোগ করছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

এই দশকের শুরুতে সংবাদপত্র প্রকাশনায় দেশে আমূল পরিবর্তন আসে। অনেকগুলো দৈনিক সংবাদপত্র খুব আড়ম্বরভাবে প্রকাশ হয়। উদাহরণ হিসেবে 'যুগান্তর', 'প্রথম আলো', 'সমকাল, 'ডেইলি স্টার' এর নাম বলা যায়। পুরনোদের মধ্যে 'ইত্তেফাক', 'জনকণ্ঠ' তো ছিলোই। এসব সংবাদপত্রে প্রতিদিন বিনোদনের জন্য একটি পাতা রাখা হয়। এছাড়া সপ্তাহে একদিন তারা বিনোদনের জন্য কমপক্ষে চার পৃষ্ঠার রঙিন বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। প্রতিদিনের বিনোদন পাতায় দৈনন্দিন খবরের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন বিশেষ ক্রোড়পত্রে নিয়মিত খবরের সঙ্গে কিছু বিশ্লেষণধর্মী লেখাও প্রকাশ হয়। অবশ্য এখন আর সংবাদপত্রে চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় না, তবে প্রোমোশনাল সংবাদ প্রকাশ করা হয়। খুলনার 'সঙ্গীতা' ও 'লিবার্টি'র মালিক ও প্রযোজক শাহাজান আলী বলেন, "আগে 'ইত্তেফাক'-এ নিয়মিত সিনেমার বিজ্ঞাপন প্রকাশ হতো।

পরের দিকে 'প্রথম আলো' কোনো কোনো সিনেমার ক্ষেত্রে মহরত থেকে রিলিজ পাওয়া পর্যন্ত নিয়মিত নিউজ করতো। এগুলো করার জন্য অবশ্য খরচ আছে। সেটা আর এখন প্রযোজক-পরিচালকরা করতে চান না।"

## উপসংহার

শিল্পমাধ্যম হিসেবে যাত্রাপালা থেকে ৬০ ও ৭০-এর দশকে চলচ্চিত্র তার নানা উপাদান সংগ্রহ করেছে এবং সেই উপাদান চলচ্চিত্রকে দর্শকের কাছাকাছি এনেছে। একইসঙ্গে গণমাধ্যম হিসেবে রেডিও, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিনও চলচ্চিত্রের উন্নয়নে নানাভাবে পাশে থেকেছে। কিন্তু টেলিভিশন ও প্রাযুক্তিক উৎকর্ষতায় আরো যেসব উপাদান—ভিসিআর, সিডি, স্যাটেলাইট টেলিভিশন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোনসেট—দর্শকের বিনোদন চাহিদা মিটিয়েছে, তারা সময়ের সঙ্গে হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রও যে চলতি প্রতিযোগিতায় তার মান ধরে রাখতে পেরেছে, এমন নয়। ফলে যা হয়েছে, গণমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র টিকে আছে ঠিকই, ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশে তা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে প্রদর্শনের মাধ্যমে বড়ো ধরনের পরিবর্তন এসেছে। প্রেক্ষাগৃহের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার পথে। সেই জায়গায় সর্বশেষ স্থান করে নিয়েছে অনলাইন ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম 'ওভার দ্য টপ' (ওটিটি)। যা ল্যাপটপ, ট্যাব, মোবাইল ফোনসেটের মতো ডিভাইসগুলোকে অনেক বেশি সক্রিয় করেছে। নির্মম সত্য হলো, গণমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের ভূমিকাও এখন প্রশ্নবিদ্ধ। স্মার্ট টেলিভিশন প্রযুক্তি চলে আসায় দর্শক এখন টেলিভিশনের কনটেন্ট না দেখে, ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে ওটিটি'কে টেলিভিশন সেটে যুক্ত করে ঘরে বসে সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্রসহ নানা বিনোদন, তথ্য, সংবাদ বিষয়ক কনটেন্ট দেখছে। এই অবস্থা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছা প্রায় অসম্ভব।

---

## টীকা

১ সাধারণভাবে যা কিছু একটা গল্প বলে তাই ন্যারেটিভ বা আখ্যান। তবে ন্যারেটিভ আর বর্ণনার (description) মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বাভাবিকের মধ্যে যখন আলাদা কোনো কিছু ঘটে, তখন সেটা আখ্যান হয়ে ওঠে। তদোরভ-এর মতে, সব ন্যারেটিভই কোনো না কোনো স্থিতাবস্থায় ব্যত্যয় ঘটায় (Todorov 1969, উদ্ধৃত, গায়েন ২০১৩, পৃ৫২)। আর স্বাভাবিকভাবে যা ঘটে তাই বর্ণনা। মূলত সবকিছুর মধ্যে ন্যারেটিভ রয়েছে। এখন পদ্ধতি হিসেবে ন্যারেটিভ অ্যানালিসিসের কাজ হলো যেকোনো ঘটনার একেবারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে যাওয়া। মূলত এখানে স্যোসুরের ভাষাতাত্ত্বিক মডেল নিয়ে কাজ শুরু হয়। পরে নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভি-স্ত্রস, ভাষাতাত্ত্বিক লিওনার্দ ব্লুমফিল্ডসহ অন্যান্যরা কাঠামোবাদের ক্ষেত্রকে আরো সম্প্রসারিত করেন। ন্যারেটিভ অ্যানালিসিসে শুরুর দিকে কাঠামো ক্রিয়াবাদী ধারার প্রাধান্য থাকলেও তা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে নানা ধরনের তত্ত্ব, ধারণা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির সমন্বয়ে। ফলে এটা আর এখন কোনো একক তত্ত্ব নয় বরং অনেকগুলো আন্তঃসম্পর্কিত তত্ত্বের সমাহার (Heinen & Sommer 2009, p 2-3), যারা একই সঙ্গে তাত্ত্বিক ও গবেষণা উপচার হিসেবে প্রায়োগিকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

২. ন্যারেটোলজি বা আখ্যানবিদ্যা হলো, যে পদ্ধতিতে কোনো ন্যারেটিভ বা বয়ান বা আখ্যান চারপাশের সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ এবং জগৎ সম্পর্কে অনুধাবন গড়ে তোলে, তার পাঠ। আখ্যানবিদ্যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, আখ্যানই ঠিক করে দেয় কীভাবে কাহিনির স্থান ও কালের ক্রমবিন্যাস হবে, যার ওপর ভিত্তি করে কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে অর্থ তৈরি করা যাবে।

৩. স্মৃতি একটি জটিল বিষয়। কখনও আমরা মনে করি, কখনও আমাদের মনে পড়ে। 'মনে করা' আর 'মনে পড়া' তো এক নয়। তা ছাড়া স্মৃতি কেবল 'মন' আশ্রয় করে বেঁচে থাকে না। আমাদের শরীরে, অভ্যেসে, প্রাত্যহিকতায়, শিক্ষায় জড়ানো থাকে স্মৃতি। স্মৃতির অনেকটা সামাজিক ব্যবহারেরও অংশ। কাউকে নিয়ে প্রদর্শনী তৈরি করা, শহিদ-মিনার গড়া—এ সবও তো স্মৃতিচর্চা। স্মৃতিচর্চার ইতিহাসও থাকে (চক্রবর্তী ২০১১, পৃ ৯২–৯৩)। এছাড়া স্মৃতির রাজনীতিও আছে। তাই ইতিহাস লেখার সময় সেই রাজনীতিকেও মাথায় রাখতে হয়।

৪. আধুনিক ভাষাতত্ত্বের পথিকৃত ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর ভাষা প্রবাহে দুই ধরনের সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করেছেন—ডায়াক্রোনিক ও সিনক্রোনিক। ডায়াক্রোনিক বা সিনট্যাগম্যাটিক রিলেশন হলো ঐতিহাসিক বা পরম্পরাগত উপাদানের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক হতে পারে ধ্বনিমূলের সঙ্গে ধ্বনিমূলের, দলের সঙ্গে দলের, ব্যাকরণের ক্ষুদ্রতম অর্থময় একটি এককের সঙ্গে আরেকটি এককের, পদগুচ্ছের সঙ্গে পদগুচ্ছের। ক্রমান্বয়িক সম্পর্ক মূলত বর্ণনা করে কার পেছনে কে বা কীসের পেছনে কী। এটি কালগত ক্রমের যথাযথ রূপ।

৫. সিনক্রোনিক বা প্যারাডিগম্যাটিক হলো বিশ্লেষণাত্মক বা আনুষঙ্গিক বা পারিকল্পিক সম্পর্ক। এটা মানুষের মননে একই সঙ্গে একই রকম আরো অনেক উপাদানের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, বিচিত্র সম্পর্কের একটি চিহ্নদল বানায় যা কিনা মোটেই সমরৈখিক নয়; বরং বাড়ির ভাঁড়ারের মতো তারা ব্যক্তির মগজে বসে থাকে আর সেখান থেকে ভাষার জোগান হয় বক্তার মুখে। এই ধরনের বিশ্লেষণে টেক্সটের মধ্যকার অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধতার যুগলের প্রকৃতিকে খুঁজে বের করা হয়। সিনক্রোনিক সম্পর্ক বলে দেয় কার সঙ্গে কে বা কীসের সঙ্গে কী।

৬. 'রূপবান' বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এক লোককাহিনি। জনপ্রিয় এই লোককাহিনির গল্প নিয়ে স্বাধীনতা পুর্ব ও পরবর্তী সময়ে যাত্রাপালা ও নাটক মঞ্চস্থ হয়।

৭. বাংলাদেশে চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রথম সিরিয়াস পত্রিকা 'ধ্রুপদী'। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদনায় ছিলেন জামাল খান, মুহম্মদ খসরু ও ইয়াসিন আমিন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদের (আগের নাম পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ) প্রথম প্রকাশনা 'ধ্রুপদী'। চলচ্চিত্র সংসদের ঘোষণা ছিলো পত্রিকাটি বার্ষিক সংকলন হিসেবে প্রকাশ হবে; কিন্তু ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত এর মোট পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশ হয়েছে। চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক, কারিগরি ও অন্যান্য দিক নিয়ে গবেষণাধর্মী লেখায় সমৃদ্ধ ছিলো 'ধ্রুপদী'।

৮. ১৯৬৪ সালে প্রাথমিকভাবে সাবেক ডিআইটি (বর্তমান রাজউক) ভবনের নীচতলা থেকে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী ১০ মাইল ব্যাসার্ধে পরীক্ষামূলকভাবে তিন মাসের জন্য অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। ওই সময় প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার হতো। ১৯৬৮ সালে ঢাকার রামপুরায় আধুনিক টেলিভিশন ভবন নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় (কাদের ১৯৯৩, পৃ ৪৫৫–৪৫৬)।

৯. ওয়েজ আনার্স স্কিম : বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকদের অর্জিত আয় সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে পাঠানোর উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে এই স্কিমটি চালু করা হয়। এই স্কিম চালুর পর থেকে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর নাম দিয়ে ভিসিআর দেশে আনতে থাকে। কিন্তু যন্ত্রটি সম্পর্কে শুল্ক বিভাগের কোনো ধারণা না থাকায় তারা তা আটকাতে বা যথাযথ শুল্ক আদায়ে সক্ষম হয়নি (কাদের ১৯৯৩, পৃ ৪৬৪)।

১০. পাশ্চাত্যে সাবানের বিজ্ঞাপন প্রচারের সঙ্গে এসব নাটক দেখানো হতো বলে এগুলোকে ডেইলি সোপ অপেরা বলা হয়।

## তথ্যনির্দেশ


আহমেদ, তারেক ২০১৮, *চলচ্চিত্রের চারদিক*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

ইভান্স-প্রিচার্ড, ই. ই. ২০০৯ (১৯৪৮), *সমাজ নৃবিজ্ঞান*, সাদাত উল্লাহ খান (অনু.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কাদের, মির্জা তারেকুল ১৯৯৩, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কাদের, মনজুর ও সিদ্দিক, হাবিবুল্লাহ, 'নেই প্রেক্ষাগৃহ নেই দর্শক', *প্রথম আলো*র বৃহস্পতিবারের বিনোদন ক্রোড়পত্র *আনন্দ*, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

কবির, আলমগীর ২০১৮, *চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি : রচনা সংগ্রহ ১ম খণ্ড*, আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান ও প্রিয়ম প্রীতিম পাল (সম্পা.) আগামী প্রকাশনী ও মধুপোক, ঢাকা।

গায়েন, কাবেরী ২০১৩, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

চক্রবর্তী, দীপেশ ২০১১, *ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

জসীমউদ্‌দীন ১৯৯৭, 'রূপবান যাত্রা'; *জসীমউদ্‌দীনের প্রবন্ধ*; পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা।

ঝুমা, জান্নাতুল ফেরদৌস ২০১৪, *বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ : অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

*দৈনিক বাংলা*, ২৫ আগস্ট ১৯৮২, ঢাকা।

*দৈনিক বাংলাবাজার*, ২৪ আগস্ট ১৯৯২, ঢাকা।

নাসরীন, গীতি আরা ও হক, ফাহমিদুল ২০০৮, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প, সংকটে জনসংস্কৃতি*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।

বাগচী, তপন ২০০৭, *বাংলাদেশের যাত্রাগান : জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বাগচী, তপন ২০১১, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছর : লোকজীবনের উপস্থাপনা*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

মুৎসুদ্দী, চিন্ময় ১৯৮৭, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সামাজিক অঙ্গীকার*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

মোমেন, আবুল, 'চলচ্চিত্রশিল্প : পূর্ণ সংরক্ষণ নাকি সুস্থ প্রতিযোগিতা', *প্রথম আলো*, ২২ মে ২০১০।

রোবের্জ, গাস্তঁ ২০০৪, *সংযোগ সিনেমা উন্নয়ন*, অনুবাদ : কৃষ্ণপদ শাণ্ডিল্য, বাণীশিল্প, কলকাতা।

শুভ, শাতিল সিরাজ ১৪১৬, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র দর্শক : রুচির বিচারে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সমান', *মাধ্যম*, ইন্সটিটিউট অব মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন স্টাডিজ, ঢাকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

*সমকাল* ৩ জুলাই ২০১১, 'চলচ্চিত্র শিল্পের ঘোরতর দুর্দিন'।

*সাপ্তাহিক পূর্বাণী*, ২১ অক্টোবর ১৯৮২, ঢাকা।

*সাপ্তাহিক চিত্রালী* প্রতিবেদন, ২৩ অক্টোবর ১৯৮১, ঢাকা।

হক, ফাহমিদুল ২০১৩, *চলচ্চিত্র সমালোচনা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হায়াৎ, অনুপম ১৯৮৭, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।

BTV Profile 1989, Silver Jubilee Publication, Dhaka.

Hoek, Lotte 2014, *Cut-pieces : Celluloid Obscenity and Popular Cinema in Bangladesh*, Colombia University Press, New York.

Habermas, Jurgen 1991, `The public sphere', *Rethinking popular culture: Contemporary perspectives in cultural studies*, Mukerji, C & Schudson, M (ed.), University of California apress, Berkeley/Los Angeles .

Heinen, Sandra & Sommer, Roy 2009, `Introduction :Narratology and Interdiciplinarity', *Narratology in the Age of Cross-Disciplinary Narrative Research*, Sandra Heinen & Roy Sommer (ed.) Walter de Gruyter, Berlin and New York.

Marlial law Regulation 7, Published in all National Dailies on 26th july, 1982.

Raju, Zakir Hossain 2015, *Bangladesh Cinema and National Identity: In Search of The Modern?*, Routledge, London.

Statistical Disest of Bangladesh 1973, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, No.9

Television Research Study, No 1 1982, National Broadcasting Academy (Present, National Institute of Mass Communication), Dhaka.